পাঠপ্রচয়

তৃতীয় ভাগ

আদর্শ প্রশ্ন -সহ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট । কলিকাতা

সূচীপত্র

প্রবন্ধ ও গল্প

কবিতা

রোগশত্রু

জল যেমন মৎস্যে, স্থল যেমন জীবজন্তুতে, বায়ু তেমনি অসংখ্য জীবাণু-বীজে পরিপূর্ণ— এ কথা আজকালকার দিনে নূতন নহে। সকলেই জানেন, গুড় ও মধুতে যে গাঁজ উৎপন্ন হয়, জিনিসপত্রে ছাতা পড়ে, মৃতদেহ পচিয়া যায়, এই জীবাণুই তাহার কারণ। এই জীবাণু-বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে অবিলম্বে পরিণতি লাভ করিয়া বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। ইহারা যে কত ক্ষুদ্র ভালো করিয়া তাহা ধারণা করা অসম্ভব। কোনো লেখক বলেন, এক বর্গ ইঞ্চি স্থানে এক থাক করিয়া সাজাইলে তাহাতে ব্যাক্‌টিরিয়া-জীবাণু লণ্ডনের জনসংখ্যার একশত গুণ ধরানো যাইতে পারে।

বিখ্যাত ফরাসিস পণ্ডিত পাস্তুর এই জীবাণুকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। এক দলের নাম দিয়াছেন এরোবি, অন্য দলের নাম অ্যানেরোবি। এরোবিগণ মৃতদেহের উপরিভাগে জন্মলাভ করিয়া তাহাকে পচাইয়া অল্পে অল্পে জ্বালাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। অ্যানেরোবিগণ গলিত পদার্থের নিম্নভাগে উৎপন্ন হইয়া তাহার ক্ষয়সাধন করিতে থাকে; বিশুদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন বাষ্প লাগিলেই তাহারা মরিয়া যায় এবং উপরিতলস্থ এরোবিগণ তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এইরূপে দুই দলে মিলিয়া পৃথিবীর সমস্ত মৃত পদার্থ অপসৃত করিতে থাকে। ইহারা না থাকিলে মৃত্যু অমর হইয়া থাকিত এবং অবিকৃত মৃতদেহস্তূপে

ধরাতলে পা ফেলিবার স্থান থাকিত না। পৃথিবীর যে অংশে এই জীবাণুদের গতিবিধি নাই সেখানে জীবজন্তু উদ্ভিদ কিছুই নাই। সেখানে বালুকাময় মরুভূমি, নয়তো অনন্ত তুষারক্ষেত্র। সেখানে মৃতদেহ কিছুতেই পচিতে চায় না; শকুনি গৃধিনী ও দৈবাগত কোনো মাংসাদ জীবের সাহায্য ব্যতীত সেখানকার মৃতদেহ অপসারণের অন্য কোনো উপায় নাই।

ফ্রান্সে যখন এক সময় গুটিপোকার মধ্যে একপ্রকার মড়ক উপস্থিত হইয়া রেশমের চাষের বড়োই ব্যাঘাত করিতে লাগিল তখন বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া পাস্তুর অন্য কর্ম ফেলিয়া সেই গুটিপোকার রোগতথ্য-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। পাস্তুর ডাক্তার নহেন, জীবতত্ত্ববিৎ নহেন, রসায়নশাস্ত্রেই তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি। মদ কী করিয়া গাঁজিয়া বিকৃত হইয়া উঠে সেই অনুসন্ধানেই তিনি অধিকাংশ সময়ক্ষেপ করিয়াছেন। সহসা গুটিপোকার রোগ নির্ণয় করিতে বসা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অনধিকারচর্চা বলিয়া মনে হইতে পারে। এবং পাস্তুরও এই কার্যভার গ্রহণ করিতে প্রথমে কিছু ইতস্তত করিয়াছিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, অণুবীক্ষণের সাহায্যে কিছু দিন সন্ধান করিতে করিতে পণ্ডিতবর দেখিতে পাইলেন, জীবাণুতে যেমন মদ গাঁজিয়া উঠে, জীবাণুই তেমনি গুটিপোকার রোগের কারণ। মদের রোগ এবং প্রাণীর রোগের মধ্যে ঐক্য বাহির হইয়া পড়িল, এবং পূর্বে তিনি যে সন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলেন এখানেও তাহার অনুবৃত্তি ধরিতে পারিলেন। অবশেষে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে

দেখা গেল, জীবশরীরের অনেক রোগ এই জীবাণুদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহারা অনুক্ষণ শনি ও কলির ন্যায় শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে ; স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ইহারা সেই অবসরে দেহ আশ্রয় করিয়া বসে এবং শরীরের রসকে বিকৃত করিতে থাকে।

বাহিরে যখন আমাদের এত অদৃশ্য শত্রু, অন্তরে অবশ্য তাহার কতকটা প্রতিবিধান আছে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে— শত্রুও যেমন, আমাদের অন্তর্বর্তী রক্ষকও সেইরূপ। কুকুরের অনুরূপ মুগুর। দুইই নিরতিশয় ক্ষুদ্র। ডাক্তার উইল্‌সন-সাহেব তৎসম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আমরা তাহারই কতক কতক সংকলন করিয়া দিলাম।

ভালো অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে রক্তকণা জলের মতো বর্ণহীন দেখায়। তাহার কারণ এই— আসলে বর্ণহীন রসের উপর অসংখ্য লোহিতকণা ভাসিতেছে ; খালি চোখে সেই লোহিতবর্ণের কণাগুলিই আমাদের নিকট রক্তকে লাল বলিয়া প্রতিভাত করে ; অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত সেই বর্ণহীন রস আমরা দেখিতে পাই না। রক্তের এই লোহিতকণাগুলির বিশেষ কাজ আছে। আমরা নিশ্বাসের সহিত যে বায়ু গ্রহণ করি ঐ লোহিতকণাগুলি তাহার মধ্য হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া লয় এবং শরীরের 'কার্বনিক অ্যাসিড বাষ্প' নামক বিষবায়ু ফুসফুসের নিকট বহন করিয়া আনে এবং আমরা তাহা প্রশ্বাসের সহিত নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিই।

রক্তস্থ শ্বেতকণার কার্য অন্যরূপ। তাহারা প্রত্যেকে অতিশয় ক্ষুদ্র জীবনবিশিষ্ট কোষ। ইহাদের আয়তন এক ইঞ্চির পঁচিশ শত ভাগের এক ভাগ। প্রটোপ্লাস্‌ম্‌ সর্বাপেক্ষা আদিম প্রাণি-পিণ্ড। রক্তের এই শ্বেতকণাগুলি সেই প্রটোপ্লাস্‌মের কোষ। আমাদের শরীরে বাস করে বটে, তথাপি ইহারা স্বাধীন জীব। এই লক্ষ লক্ষ প্রাণিপ্রবাহ আমাদের শরীরে যথেচ্ছ চলাফেরা করিয়া বেড়ায়; ইহাদের গতিবিধির উপরে আমাদের কোনো হাত নাই। ইহারা অনেক সময় যেন যদৃচ্ছাক্রমে রক্তবহ নাড়ী ভেদ করিয়া আমাদের শরীরতন্তু-মধ্যে প্রবেশ করে, এবং দেহের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে বাহির হয়।

অণুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, অ্যামীবা প্রভৃতি জীবাণুদের ন্যায় ইহারা অনুক্ষণ আকার পরিবর্তন করিতে থাকে। এবং ইহাও দেখা গিয়াছে, খাদ্যকণা পাইলে ইহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া রীতিমতো পরিপাক করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই আহারের ক্ষমতা দেখিয়াই পণ্ডিতগণ ইহাদের নাম ফ্যাগোসাইট অর্থাৎ ভক্ষককোষ রাখিয়াছেন। ইহার অপর নাম লিউকোসাইট বা শ্বেতকোষ।

ইহারা যে কিরূপ আহারপটু তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সকলেই জানেন ব্যাঙাচি ব্যাঙ হইয়া দাঁড়াইলে তাহার লেজ অন্তর্হিত হইয়া যায়। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ব্যাঙাচির রক্তবহ নাড়ী ত্যাগ করিয়া বিস্তর শ্বেতকোষ দলে দলে তাহার লেজটুকু অধিকার করিয়া আহারে প্রবৃত্ত

হইয়াছে। সেখানকার স্নায়ু এবং মাংসপেশী ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। শরীরের অধিবাসীরা এমনতরো মনঃসংযোগপূর্বক লাগিলে তুচ্ছ পুচ্ছটুকু আর কতক্ষণ টিকিতে পারে। বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে ব্যাঙাচির কান্‌কো লোপ পায়, সেও এইরূপ কারণে।

কেবল যে শরীরের অনাবশ্যক ভার মোচন ইহাদের কাজ তাহা নহে। রোগস্বরূপে বাহিরের যে-সকল জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ইহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া রীতিমতো হাতাহাতি-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বাহিরের আক্রমণ-কারিগণ যদি যুদ্ধে জয়ী হয় তবে আমরা জ্বর প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি দ্বারা অভিভূত হই, আর যদি আমাদের শরীরের রক্ষক সৈন্যদল জয়ী হয় তবে আমরা রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাই।

কেবল রোগ কেন, পীড়াজনক যে-কোনো পদার্থ আমাদের শরীরে নিবিষ্ট হইলে এই সর্বভুক্‌গণ তাহাকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতে চেষ্টা পায়। চোখে একটুকু বালি পড়িলে সেটাকে লোপ করিবার জন্য ইহারা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসে, চক্ষু সেই সংগ্রামচিহ্নে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। শরীরে কিছু বিদ্ধ হইলে এই সৈনিক কণিকাগুলি ভিড় করিয়া আসিয়া সে স্থান লাল করিয়া তোলে। ক্ষতস্থানের পুঁজ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ব্যাধিবীজ-গুলিকে ইহারা চারি দিক হইতে আক্রমণ করিয়া খাইবার চেষ্টা করিতেছে।

শরীরের সবল অবস্থায় বোধ করি এই শ্বেতকোষগুলি স্বভাবত তেজস্বী থাকে এবং ব্যাধিবীজকে সহজে পরাহত করিতে

পারে। অনাহার অতিশ্রম অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে শরীরের দুর্বল অবস্থায় যখন ইহারা হীনতেজ থাকে তখন ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্রভৃতির ব্যাধিবীজগণ অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করে।

যাহা হউক, বায়ুবিহারী জীব-বীজাণুগণ ব্যাধিশস্য-উৎপাদনের জন্য সর্বদা উপযুক্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতেছে, এই কথা স্মরণ করিয়া রাখিলে আহার পানীয় ও বাসস্থান পরিষ্কার রাখা আমাদের নিজের ও প্রতিবেশীদের হিতের পক্ষে কত আবশ্যক তাহা কাহারও অবিদিত থাকিবে না।

আমেরিকার একটি বিদ্যালয়

লোকহিতকর কাজে অল্প অল্প করিয়া আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে। কিন্তু এই প্রবৃত্তি যথেষ্ট ব্যাপক হয় নাই এবং তাহার মধ্যে প্রাণশক্তিও অল্প। অল্প কাজই আরম্ভ হয় এবং তাহা অল্প দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সফলতার মূর্তি আমরা প্রায়ই সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই না বলিয়া দেশের চিত্তে উৎসাহের সঞ্চার হয় না।

কোনো অনুষ্ঠান যে ভালো করিয়া শেষ পর্যন্ত গড়িয়া উঠিতে চায় না তাহার প্রধান কারণ, আমরা দুর্বল চেষ্টা লইয়া কাজ করি। আমরা অল্পই খরচ করিয়া হাতে হাতে বেশি লাভ করিবার প্রত্যাশা করি। নিষ্ফলতার জন্য আমরা অদৃষ্টকে অবস্থাকে এবং কর্মক্ষেত্রকেই দায়ী করি এবং নিজেকে নিষ্কৃতি দিই।

আমাদের সংকল্পের মধ্যে, চেষ্টার মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে এই-যে একটা বলহীনতা আছে, সে দিকে আমাদের বিশেষভাবে মনোযোগ করিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের নিজের মধ্যে যে অপরাধ ও অসম্পূর্ণতা আছে তাহাকে অস্বীকার করিয়া অহংকার করিলে আমরা বড়ো হইব না।

অন্য দেশে প্রতিকূল অবস্থায় সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা কাজ কেমন করিয়া সার্থক হইয়া উঠে তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের পক্ষে বড়ো আবশ্যক। সেইজন্যই আমরা একখানি আমেরিকান পত্র হইতে নিম্নলিখিত ইতিহাসটি সংকলন করিয়া দিলাম।

জর্জিয়া য়ুনাইটেড স্টেট্সের একটি দাক্ষিণাত্য প্রদেশ। সেই জর্জিয়ার পার্বত্য অংশে যাহারা বাস করে তাহাদের পড়াশুনা একেবারেই নাই বলিলেই হয়। তাহাদের কুটিরগুলি দূরে দূরে স্থাপিত; অবস্থা অত্যন্ত হীন। ছেলেরা লেখাপড়া শিখিয়া বাপ-পিতামহের চেয়ে কোনো অংশে বড়ো হইয়া উঠিবে, ইহা তাহারা শ্রেয় বলিয়া মনে করে না।

এইরূপ নিভৃত একটি পার্বত্য গ্রামের কুটির কোনো-একটি নগরবাসিনীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার নাম ছিল কুমারী মার্থা বেরি (Miss Martha Berry)। গ্রামটির নাম ছিল পোসম-ট্রট (Possum Trot)। এই কুটিরটিকে বেশ মনের মতো বাড়াইয়া লইয়া এইখানে শৈলাশ্রমের আরণ্য শোভা ভোগ করিবেন, এই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।

বিলাসী সমাজের উপযুক্ত বেশভূষা করিয়া নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে আমোদ-আহ্লাদে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইবার পক্ষে তাঁহার আয় যথেষ্ট ছিল। ঘরের কাজ সমস্তই কাফ্রি দাসদাসীর দ্বারাই সম্পন্ন হইত। সমাজে আদর পাইবার ও সৎপাত্রে বিবাহ হইবার মতো বুদ্ধি বিদ্যা ও সৌন্দর্যের অভাব তাঁহার ছিল না। তিনি যে অশিক্ষিত গিরিবাসীদের উন্নতিসাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন, ইহা তাঁহার নিজেরও স্বপ্নের অগোচর ছিল।

একদিন অপরাহ্নে মার্থা বেরি তাঁহার কুটিরে বসিয়া আছেন, এমন সময় বনপথ দিয়া গুটিকয়েক ছোটো ছোটো ছেলে সংকুচিত কৌতূহলে তাঁহার কুটিরের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। মার্থা

বেরি তাহাদিগকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, তাহারা কোনো কালে বিদ্যালয়ে যায় নাই। তিনি তাহাদিগকে ঘরে লইয়া বই পড়িয়া শুনাইলেন, গল্প বলিলেন ; তাহারা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। তাহার পরের রবিবারে তাহারা তাহাদের ভাইবোনদের সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। এমনি করিয়া কয়েক সপ্তাহ না যাইতেই মিস বেরি স্বয়ং একটি ঘোড়ার গাড়ি লইয়া গিরিবাসীদের ঘরে ঘরে বালকবালিকা এবং তাহাদের অভিভাবকদিগকে বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ দিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

প্রথমে তিনি প্রতি রবিবারে বাইবেলের গল্প প্রভৃতি পড়িয়া শুনাইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমে সেই রবিবাসরীয় পাঠসভার সঙ্গে দৈনিক বিদ্যালয় যোগ করিলেন। সামান্য বেতন যাহা জুটিত তাহাতে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী পাওয়া কঠিন হইল ; মিস বেরি নিজের আয় হইতে খরচ জোগাইতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলে পাওয়াই শক্ত। পড়াশুনা করিয়া কোনো লাভ নাই, বরঞ্চ তাহাতে ছেলে মাটি হইবে— ইহাই লোকের ধারণা। সেইজন্য সামান্য কোনো ছুতাতেই বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠানো বন্ধ হইত।

এইরূপে কোনোমতে বিদ্যালয়কে খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য যখন তিনি চেষ্টা করিতেছেন তখন আর-একটি চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, হাতের কাজ করিয়া খাটিয়া খাওয়া যে হেয় নহে, এবং নিজের চেষ্টায় নিজের উন্নতি-সাধন করা যে সকলেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত, ইহাই এখানকার

নিশ্চেষ্ট উদাসীন লোকদিগকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চাই। নিজেদের দারিদ্র্য ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হইয়া জীবন না কাটাইয়া যাহাতে তাহারা একটা জনসমাজ গড়িয়া তোলে এবং নিজের উদ্যমে রাস্তা ঘাট তৈরি ও স্কুল স্থাপন করিয়া নিজের শক্তিতেই সকলে সমবেতভাবে বড়ো হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। এখন তাহারা যে রূপে ক্ষেত্র চাষ করে তাহাতে ফসল ভালো হয় না এবং যে দুই-তিনটি ফসল তাহারা বরাবর আবাদ করিয়া আসিতেছে তাহা ছাড়া আর-কিছুই করিতে চায় না। ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। ইহারা নির্বিচারে বন কাটিয়া, জঙ্গল পোড়াইয়া কৃষি-ক্ষেত্রের সর্বনাশ করিতেছে। এ সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া চাই।

সাশ্রম বিদ্যালয় (Boarding School) ব্যতীত এ-সমস্ত শিক্ষা দিবার অন্য উপায় নাই। মিস বেরি তাঁহার সম্পত্তি দিয়া একটি দশ-কুঠরি-ওয়ালা বাড়ি তৈরি করাইয়া তাহার সঙ্গে খানিকটা বনভূমি যোগ করিয়া লইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণা একজন শিক্ষিতা মহিলা তাঁহার সহিত যোগ দিলেন।

আশ্রমে ছাত্র পাওয়া আরও কঠিন। দুটি-একটি করিয়া অবশেষে পাঁচটি ছেলে ও দুইটি শিক্ষক লইয়া স্কুল আরম্ভ হইল। নিভৃত পাহাড়ের মধ্যে পাঁচটি গ্রাম্য ছেলেকে পড়াইবার কাজে জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসাহ কত অল্প লোকের হইতে পারে, সে কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। কারণ, আড়ম্বর একটা মস্ত

বেতন— সেটুকু হইতেও বঞ্চিত হইলে ত্যাগমাহাত্ম্যের আকর্ষণ চলিয়া যায়।

বিদ্যালয় খোলা হইলে পরদিন প্রাতঃকালে কিরূপ ক্লাস আরম্ভ হইল দেখা যাক। একটা জলের বড়ো হাঁড়ি উনানে চড়ানো আছে। কাছে বড়ো বড়ো দুইটা গামলা। একরাশ ময়লা কাপড় এক ধারে জমা করা রহিয়াছে।

শিক্ষয়িত্রী তাঁহার পাঁচটি ছাত্রকে বলিলেন, "কাপড় কেমন করিয়া কাচিতে হয় দেখাইয়া দিতেছি। তাহার পরে তোমাদের নিজেদের কাপড় কাচিতে হইবে।"

ছেলেরা বলিল, "না ঠাকরুন, সে হইবে না। পুরুষমানুষে আবার কবে কাপড় কাচে।"

শিক্ষয়িত্রী কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, আমি কাচি, তোমরা দাঁড়াইয়া দেখো।"

অবশেষে লজ্জা পাইয়া একজন ছেলে আরম্ভ করিল। ক্রমে সকলেই যোগ দিল। এখন ঝাঁট দেওয়া হইতে রান্না পর্যন্ত সমস্তই বিদ্যালয়ের ছেলেরা অসংকোচে সম্পন্ন করে।

একজন শিক্ষিত কৃষক ছাত্রদিগকে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া চাষের কাজ শিখাইতে লাগিল এবং মিস বেরি ও মিস ব্রুস্টার তাহাদিগকে দুই ঘণ্টা লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন।

ছাত্র অল্পে অল্পে বাড়িতে লাগিল। উপযুক্ত ছুতারের নির্দেশমতো ছাত্ররাই নিজেদের বাসের ঘর তৈরি করিয়া তুলিল।

এক্ষণে ছয় বৎসর হইয়া গেছে। ছাত্র এখন দেড়শত।

দশটি ভালো ভালো কুটির প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার প্রায় সমস্তই ছেলেদের তৈরি। বহুশত বিঘা ক্ষেত্র লইয়া চাষ চলিতেছে। তাহার মাঝখান দিয়া একটি পাকা রাস্তা গিয়াছে, তাহাও ছেলেরা তৈরি করিয়াছে। বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি বড়ো গোয়াল আছে। কোন্ জাতের গোরুর কী গুণ তাহা ছেলেরা নিজেরা দেখিয়া শিখিয়া লয়। ইহা ছাড়া ফলের বাগান আছে এবং এই ফল টিনের কৌটায় ভরিয়া বিক্রয় করিবার জন্য কারখানা-ঘর স্থাপিত হইয়াছে।

এতবড়ো একটি কাণ্ড করিয়া তুলিবার জন্য ছেলেদের যেমন খাটিতে হইয়াছে, শিক্ষকদিগকেও সেইরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে। যাঁহারা দেড়শত ডলার বেতনের যোগ্য তাঁহারা ত্রিশ ডলার মাত্র অর্থাৎ কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের মতো বেতন লইয়া কাজ করিয়াছেন। মিস বেরির পরিধেয় বস্ত্র যখন একটিতে আসিয়া ঠেকিয়াছিল তখন ছেলেরা নূতন কাপড় কিনিবার জন্য তাঁহাকে সাড়ে চার ডলার চাঁদা নিজেদের মধ্য হইতে তুলিয়া দিয়াছিল। বিদ্যালয়ের পঞ্চম বৎসরে ছাত্রেরা নিজে খাটিয়া উপার্জন করিয়া প্রায় আটশত টাকা বিদ্যালয়কে দান করিয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যেখানেই গিয়াছে সেইখানেই শ্রমশীলতা ও ত্যাগশীলতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে।

ভোররাত্রে চারিটার সময় বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ, চুলায় আগুন ধরানো। অনতিকাল পরে ছাত্রেরা আসিয়া রান্না চড়াইয়া দেয়। ছয়টার মধ্যেই আহার প্রস্তুত হইয়া যায়। তার

পরে প্রত্যেক ছাত্রকে অন্তত দুই ঘণ্টা মাঠে ও চার ঘণ্টা ক্লাসে শিক্ষালাভ করিতে হয়। বিদ্যালয়ের এমন কোনো কাজই নাই যাহা ছেলেরা নিজের হাতে না করে। এ কথা মনে রাখিতে হইবে, য়ুনাইটেড স্টেট্‌সের দাক্ষিণাত্যে কাফ্রি দাসেরাই সমস্ত হাতের কাজ করে বলিয়া এই-সমস্ত কাজ সেখানে শ্বেতকায়দের পক্ষে বিশেষ ঘৃণ্য ও লজ্জাকর বলিয়া গণ্য। এরূপ সংস্কার কাটাইয়া ওঠা যে কিরূপ কঠিন তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

কাবুলিওয়ালা

আমার পাঁচ বছরের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল; তাহার পর হইতে সে যতক্ষণ জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেন, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি, এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল। সে কিচ্ছু জানে না, না?"

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। "দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মা গো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে! কেবলই বকে, দিনরাত বকে!"

সে পরক্ষণেই আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতি দ্রুত উচ্চারণে আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চাৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।"

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা-দুইচার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ-গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল; তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যা-রত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝুলি ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু মিনির চাৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতরে সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এ দিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন, তথাপি লোকটাকে ঘরে

ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুশ, ইংরেজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষা-নীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমার লড়কি কোথা গেল।"

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম— সে আমার গা ঘেঁষিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিশমিশ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশতঃ বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চের উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে, কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামত দো-আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান্ শ্রোতা সে কখনও পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিশমিশে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম,

"উহাকে এ-সব কেন দিয়াছ। অমন আর দিয়ো না।"—বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোলো-আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চক্‌চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই এ আধুলি কোথায় পেলি।"

মিনি বলিতেছে, "কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।"

তাহার মা বলিতেছেন, "কাবুলিওয়ালার কাছ হতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি।"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাই নি, সে আপনি দিলে।"

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই-যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তা বাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুব্ধ হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে—যথা, রহমৎকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলি-

ওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী।”

রহমৎ একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, “হাঁতি।”

অর্থাৎ তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম। খুব যে বেশি সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত—এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরও একটি কথা প্রচলিত ছিল। রহমৎ মিনিকে বলিত, “খোঁখী, তোমি সস্যুর বাড়ি কখুনু যাবে না ?”

বাঙালিঘরের মেয়ে আজন্মকাল ‘শ্বশুরবাড়ি’ শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে শিশু-মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এইজন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা-কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। সে উলটিয়া জিজ্ঞাসা করিত, “তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে ?”

রহমৎ কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, “হামি সস্যুরকে মারবে।”

শুনিয়া মিনি শ্বশুর-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা

দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনও কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেইজন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী —বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন-কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী-পর্বত-অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এ দিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এইজন্য সকালবেলায় আমার ছোটো ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুই ধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাই-করা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে; পাগড়ি-পরা বণিক ও পথিকেরা কেহ-বা উটের ’পরে, কেহ-বা পদব্রজে, কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে সেকেলে চক্‌মকি-ঠোকা বন্দুক; কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত, আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত-স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা

যে সর্বত্রই চোর, ডাকাত, মাতাল, সাপ, বাঘ, ম্যালেরিয়া, শুঁয়োপোকা, আর্‌সোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এত দিন (খুব বেশি দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমৎ কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন, "কখনও কি কাহারও ছেলে চুরি যায় না। কাবুলদেশে কি দাসব্যবসায় প্রচলিত নাই। একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব।"

আমাকে মানিতে হইল ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে, কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এইজন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমৎকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমৎ দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয়, কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে

পারে না সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে ; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা-জামা-পায়জামা-পরা সেই ঝোলা-ঝুলি-ওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

কিন্তু যখন দেখি মিনি "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে, তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রুফ-শীট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্বে আজ দুই-তিন দিন হইতে শীতটা খুব কন্‌কনে হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে— মাথায়-গলাবন্ধ-জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্‌ভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় একটা ভারি গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমৎকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে— তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন, এবং একজন পাহারা-ওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহরা-ওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত। মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে, এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমৎ তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমৎ সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময়ে "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না, সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে ?"

রহমৎ হাসিয়া কহিল, "সিখানেই যাচ্ছে।"

দেখিল, উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, "সসুরাকে মারিতাম, কিন্তু কি করিব, হাত বাঁধা।"

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমতো নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম, তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চলহৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল, এমনকি এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না! আমি তো তাহার সহিত এক-প্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতন-ধৌত রৌদ্রে যেন সোহাগায়-গলানো নির্মল সোনার মতো রঙ ধরিয়াছে। এমনকি কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টক-জর্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলার উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদ-ব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত

সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে, হাঁকডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমৎ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহাব সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কী বে রহমৎ, কবে আসিলি।"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলায় জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট্ করিয়া উঠিল। কোনো খুনীকে কখনও প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, আজ তুমি যাও।"

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না ?"

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্বের মতো "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকাবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনোরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমনকি, পূর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে একবাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিশমিশ বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল —তাহার নিজের সে ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম, "আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে "বাবু সেলাম" বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময় দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙুর এবং কিশমিশ বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ

আমার হাত চাপিয়া ধরিল ; কহিল, “আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে— আমাকে পয়সা দিবেন না। বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কি আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কি আছে। আমি তাহার মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।”

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক-টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু যত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহারই চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমৎ প্রতি বৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে— যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম— তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বত-গৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ

করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল, কিন্তু আমি কিছুতেই কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলি-পরা, কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জ-ভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, "খোখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস ?"

মিনি এখন শ্বশুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্বের মতো উত্তর দিতে পারিল না— রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেইদিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমৎ মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন করিয়া আলাপ করিতে হইবে— তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে।

সকালবেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমৎ কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, "রহমৎ, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।"

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও বাদ পড়িল, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বাগান

ভদ্রতার ভাষা, পরিচ্ছদ এবং আচরণের একটু বিশেষত্ব আছে। কুৎসিত শব্দ ভদ্রলোকের মুখ দিয়া বাহির হইতে চায় না, এবং যাহার মনে আত্মসম্মানবোধ আছে সে কখনও হাঁটুর উপরে একখানা ময়লা গামছা পরিয়া সমাজে সঞ্চরণ করিতে পারে না। তেমনি ভদ্রলোকের বাসস্থানেরও একটা পরিচ্ছদ এবং ভাষা আছে, নিদেন থাকা উচিত। ভদ্রলোকের কুলে-শীলে ঘরে-বাইরে সর্বত্রই একটা উজ্জ্বলতা থাকা চাই— যেখানে তাহার আবির্ভাব সেখানে পৃথিবী আদৃত, শোভিত এবং স্বাস্থ্যময় যদি না হয়, যদি তাঁহার চারি দিকে আগাছা জঙ্গল বাঁশঝাড় পানাপুকুর এবং আবর্জনাকুণ্ড থাকে, তবে সেটা যে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হয় এ কথা আমরা সকল সময় মনে করি না। কেবল লোক দেখাইবার কথা হইতেছে না; অশোভনতার মধ্যে বাস করিলে আপনার প্রতি তেমন শ্রদ্ধা থাকে না, নিজের চতুর্দিক নিজেকে অপমান করিতে থাকে, আর সুখ-স্বাস্থ্যের তো কথাই নাই। আমরা যেমন স্নান করি এবং শুভ্র বস্ত্র পরি তেমনি বাড়ির চারি দিকে যত্নপূর্বক একখানি বাগান করিয়া রাখা ভদ্রপ্রথার একটি অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ হওয়া উচিত

রসিক লোকেরা পরিহাস করিয়া বলিবেন, উনবিংশ শতাব্দীর আর-একটা নূতন বাবুয়ানার অবতারণা হইতেছে— অন্নচিন্তায় রাত্রে ঘুম হয় না, বাগান করিবার অবসর কোথায়। এ কথাটা

একটা ওজর মাত্র। কাজের তো আর সীমা নাই! বঙ্গদেশে এমন কোন্ পল্লী আছে যেখানে প্রায় ঘরে ঘরে দুই-চারিটি অকর্মণ্য ভদ্রলোক পরমালস্যে কালযাপন না করেন। শহরের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে অবসর নাই এমন ব্যস্ত লোক অতি বিরল। তাহা ছাড়া বাংলাদেশের মৃত্তিকায় একখানি বাগান করিয়া রাখা যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সাধ্যাতীত তাহাও নহে। তবে আলস্য একটা অন্তরায়, এবং ঘরের চারি দিক সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যজনক করিয়া রাখা তেমন আবশ্যক বলিয়া ধারণা না হওয়ায় তাহার জন্য দুই পয়সা ব্যয় করিতে আমরা কাতর বোধ করি এবং যেমন-তেমন করিয়া ঝোপঝাড় ও কচুবনের মধ্যে জীবন যাপন করিতে থাকি। এইজন্য বাংলার বসতি-গ্রামে মনুষ্যযত্নকৃত সৌন্দর্যের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না, কেবল পদে পদে অযত্ন, অনাদর ও আলস্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষের ভিতরে বাহিরে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। অন্তর বাহিরকে আকার দেয় এবং বাহিরও অন্তরকে গড়িতে থাকে। বাহিরের চতুর্দিক যদি অযত্নসম্ভূত শ্রীহীনতায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে তবে অন্তরের স্বাভাবিক নির্মল পারিপাট্য-প্রিয়তাও অভ্যাসক্রমে জড়ত্ব পাইতে থাকে। অতএব চারি দিকে একখানি বাগান তৈরি করা একটা মানসিক শিক্ষার অঙ্গ বলিলেই হয়। ওটা কিছুতেই অবহেলার যোগ্য নহে। সন্তানদিগকে সৌন্দর্য নির্মলতা এবং যত্নসাধ্য নিরলস পারি-পাট্যের মধ্যে মানুষ করিয়া তুলিয়া অলক্ষ্যে তাহাদিগের হৃদয়ে

উচ্চ আত্মগৌরব সঞ্চার করা পিতামাতার একটা প্রধান কর্তব্য। চারি দিকে অবহেলা অমনোযোগ আলস্য এবং যথেচ্ছ কদর্যতার মতো কুশিক্ষা আর কী আছে বলিতে পারি না। বাহিরের ভূখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তঃকরণ পর্যন্ত সর্বত্রই নিয়তজাগ্রত চেষ্টা এবং উন্নতি-ইচ্ছা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিলে ছেলেরা মানুষ হইয়া উঠিতে পারে। বাসস্থানের বাহিরে যেখানে অবহেলায় জঙ্গল জন্মিতেছে, অযত্নে সৌন্দর্য দূরীভূত হইতেছে, সেখানে ঘরের মধ্যে মনের ভিতরেও আগাছা জন্মিতেছে এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রতি ঔদাসীন্য মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে গোপাল-নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ; তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন তিনি ঠিক তাহার উল্‌টা করিয়া বসিতেন। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন, "পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সেদিন বলিতেন, আজ ভালো কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে ; তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে ; শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না। পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না, সঙ্গে করিয়া টাঁকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।"

পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের সময়ে যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন তখন প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালিজাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়; বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিত-লেখকের সাদৃশ্য ছিল না। "রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়।" কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ-রক্ষা। ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়োবাজারের বাসা হইতে পটল-ডাঙায় সংস্কৃতকলেজে যাত্রা করিতেন; লোকে মনে করিত, একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জয় বালকের শরীরটি খর্ব শীর্ণ, মাথাটা প্রকাণ্ড—স্কুলের ছেলেরা সেইজন্য তাঁহাকে 'যশুরে কই' ও তাহার অপভ্রংশে 'কস্তুরে জই' বলিয়া খ্যাপাইত।

তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিয়া কথা কহিতে পারিতেন না।

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্মানিগির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগুঁয়ে ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ। শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কঠিন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসনে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

ইহার উপরে গৃহকর্মও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন। দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুই বেলা সকলের রন্ধনাদি কার্য করিতেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথবাবুর বাজারে বাটামাছ ও আলু-পটল-তরকারি ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাটনা বাটিয়া, উনান ধরাইয়া রন্ধন করিতেন। বাসায় তাঁহারা চারিজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ট, মুখ ও বাসন ধৌত করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও স্কুলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠানুশীলন করিতেন।

এই তো অবস্থা। এ দিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন তখন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন

ইহাতেই তাহা ব্যয় হইত। আবার দারোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পূজার ছুটির পর দেশে গিয়া “দেশস্থ যে-সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে, গামছা পরিধান করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।”

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকটে নিজে প্রধান দয়ার পাত্র সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তাঁহার চরিত্র সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার মতো অবস্থার ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্ব দেহ এবং প্রকাণ্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতো দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড়ো কঠিন; কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়াছেন নিজের কোনোপ্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা-রায়বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই ‘দয়ার সাগর’ নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট্ উইলিয়ম

কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃতকলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট্ সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যোপলক্ষে তিনি যে-সকল ইংরেজ প্রধান কর্মচারীদের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতি -ভাজন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনও মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরেজপ্রসাদগর্বিত সাহেবানুজীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে। একবার তিনি কার্যোপলক্ষে হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপাল কার-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট-বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপরে ঊর্ধ্বগামী করিয়া দিয়া, বাঙালি ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতারক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার-সাহেব কার্যবশতঃ সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটিজুতা-সমেত তাঁহার সর্বজনবন্দনীয় চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহংকৃত ইংরেজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন। বোধ করি শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সন্তোষলাভ করেন নাই।

ইতিমধ্যে কলেজের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে তাহার সহিত কর্তৃপক্ষের মতান্তর হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র কর্মত্যাগ করিলেন।

সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ময়েট-সাহেব অনেক উপরোধ অনুরোধ করিয়াও কিছুতেই তাঁহার পণ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। আত্মীয়বান্ধবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার চলিবে কী করিয়া।" তিনি বলিলেন, "আলু পটল বেচিয়া মুদির দোকান করিয়া দিন চালাইব।" তখন বাসায় প্রায় কুড়িটি বালককে তিনি অন্নবস্ত্র দিয়া অধ্যয়ন করাইতেছিলেন— তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিলেন না। তাঁহার পিতা পূর্বে চাকরি করিতেন— বিদ্যাসাগরের সবিশেষ অনুরোধে কার্যত্যাগ করিয়া বাড়ি বসিয়া সংসারখরচের টাকা পাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাজ ছাড়িয়া দিয়া প্রতি মাসে ধার করিয়া পঞ্চাশ টাকা বাড়ি পাঠাইতে লাগিলেন। এই সময় ময়েট-সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর কাপ্তেন ব্যাঙ্ক্‌-নামক একজন ইংরেজকে কয়েক মাস বাংলা ও হিন্দী শিখাইতেন। সাহেব যখন মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বেতন দিতে গেলেন, তিনি বলিলেন, "আপনি ময়েট-সাহেবের বন্ধু এবং ময়েট-সাহেব আমার বন্ধু— আপনার কাছে আমি বেতন লইতে পারি না।"

১৮৫০ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতকলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও ১৮৫১ খৃস্টাব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত হন। আট বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া, শিক্ষা-বিভাগের নবীন কর্তা এক তরুণ সিবিলিয়ানের সহিত মনান্তর হইতে থাকায় ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে তিনি কর্ম ত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্রের লোক ছিলেন;

অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন; উপরিতন কর্তৃপক্ষের মতের দ্বারা কোনোরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আপন সংকল্পের প্রবাহ তিলমাত্র পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। কর্মনীতির নিয়মে ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না; কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, অধীনে কাজ চালাইবার গুণগুলি তাঁহাকে দেন নাই। উপযুক্ত অধীনস্থ কর্মচারী বাংলাদেশে যথেষ্ট আছে— বিদ্যাসাগরকে দিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসংগত বোধ করিয়াছিলেন।

সাক্ষী

ডাক্তার যখন জবাব দিয়া চলিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলো।"

গুরুচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।"

রামকানাই কাগজ কলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন, "আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্মপত্নী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।"

রামকানাই লিখিলেন, কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড়ো আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন, তথাপি এই আশায় নবদ্বীপকে কিছুতেই তিনি চাকরি করিতে দেন নাই এবং সকাল সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই। তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নির্জীব হস্তে যাহা সই করিলেন তাহা কতকগুলা কম্পিত বক্ররেখা কি তাঁহার নাম, বুঝা দুঃসাধ্য।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল, বলিল, "মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোনার-চাঁদ ভাইপো থাকিতে—"

রামকানাই ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "মেজোবউ, তোমার তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন। দাদা গেলেন, এখন আমি তো রহিয়া গেলাম। তোমার যা-কিছু বক্তব্য আছে অবসরমতো আমাকে বলিয়ো, এখন ঠিক সময় নয়।"

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল তখন তাহার জ্যাঠা-মহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল, "দেখিব, মুখাগ্নি কে করে. এবং শ্রাদ্ধশান্তি যদি করি তো আমার নাম নবদ্বীপ নয়।" গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ-সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতেই তার বিশেষ পরিতৃপ্তি। লোকে যদি তাহাকে ক্রীশ্চান বলিত সে জিভ কাটিয়া বলিত, 'রামঃ! আমি যদি ক্রীশ্চান হই তো গোমাংস খাই।' জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যোমৃত অবস্থায় সে যে পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমতো ইহা ছাড়া আর কোনো প্রতিশোধের পথ ছিল না। নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। যতদিন ইহলোকে থাকা যায়, জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনোক্রমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে।

রামকানাই বরদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিলেন, "বউ-ঠাকুরানী. দাদা তোমাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই

তাঁহার উইল। লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়ো।”

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই-গাড়ি-সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়া অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন; অবশেষে কাতর স্বরে কহিলেন, “আমার অপরাধ কী। আমি তো দাদা নই।”

নবদ্বীপের মা ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, “না, তুমি বড়ো ভালো মানুষ, তুমি কিছু বোঝ না। দাদা বললেন লেখো, ভাই অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান।”

এ দিকে নবদ্বীপ তাহার বুদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, “কোনো ভাবনা নাই। এ বিষয় আমি পাব। কিছু দিনের মতো বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।”

নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিসুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, সুতরাং কথাটা তারও যুক্তিযুক্ত মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা একটা যেমন-তেমন ছল করিয়া কিছু দিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই বরদাসুন্দরী এবং নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইল-জালের অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত

হইল। নবদ্বীপ তাহার নিজের নামে যে উইলখানি বাহির করিয়াছে তাহার নামসহি দেখিলে গুরুচরণের হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রমাণ হয়; উইলের দুই-একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসুন্দরীর পক্ষে নবদ্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী, এবং সহি কারও বুঝিবার সাধ্য নাই। তাঁহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল; সে বলিল, "দিদি, তোমার ভাবনা নাই, আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরও সাক্ষী জুটাইব।"

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল তখন নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইতিমধ্যে রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। অবাক হইয়া যখন তাহার মর্মগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন তখন নবদ্বীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন, "হাড়জ্বালানী ডাকিনী কেবল যে বাছা নবদ্বীপকে তাহার স্নেহশীল জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায় তাহা নহে, আবার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।"

অবশেষে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "তোরা এ কী সর্বনাশ করিয়াছিস।"

গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "কেন, এতে

নবদ্বীপের দোষ হয়েছে কা। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!"

হতবুদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন, তাহার স্ত্রীপুত্র উভয়ে মিলিয়া কখনও বা তর্জন-গর্জন, কখনও বা অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্যন্ত স্পর্শ করিলেন না।

এইরূপে দুই দিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদাসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে তখন রামকানাইকে ডাক পড়িল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্ককণ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন; বহু দূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতি ধীর বক্র গতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাহার

পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজ হস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছে তাহা মিথ্যা।" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিস্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটর্নিকে বলিলেন, "বাই জোভ! লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম।"

মামাতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিদিকে বলিল, "বুড়া সমস্ত মাটি করিয়াছিল, আমার সাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়।"

দিদি বলিলেন, "বটে! লোক কে চিনতে পারে? আমি বুড়োকে ভালো ব'লে জানতুম।"

কারারুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে! সাক্ষীর বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই। এমন-তরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।

ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম

অগস্ট মাস এ দেশে গ্রীষ্মঋতুর অধিকারের মধ্যে গণ্য। সে সময়ে শহরের লোক পাড়াগাঁয়ে হাওয়া খাইয়া আসিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। আমাদের দেশে এমন অবারিত ভাবে আমরা প্রকৃতির সঙ্গ পাই, সেখানে আকাশ এবং আলোক এমন প্রচুর-রূপে আমাদের পক্ষে সুলভ যে, তাহার সঙ্গে যোগসাধনের জন্য বিশেষভাবে আমাদিগকে কোনো আয়োজন করিতে হয় না। কিন্তু এখানে প্রকৃতিকে তাহার ঘোমটা খুলিয়া দেখিবার জন্য লোকের মনের ঔৎসুক্য কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। ছুটির দিনে ইহারা যেখানে একটু খোলা মাঠ আছে সেইখানেই দলে দলে ছুটিয়া যায়; বড়ো ছুটি পাইলেই শহর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এমনি করিয়া প্রকৃতি ইহাদিগকে চলাচলের মুখে রাখিয়াছে, ইহাদিগকে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে দেয় না। ছুটির ট্রেনগুলি একেবারে লোকে পরিপূর্ণ, বসিবার জায়গা পাওয়া যায় না। সেই শহরের উড়ুক্কু মানুষের ঝাঁকের সঙ্গে মিশিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

গম্যস্থানের স্টেশনে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা তাঁহার খোলা গাড়িটি লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। গাড়িতে যখন চড়িলাম তখন আকাশে মেঘ। ছায়াচ্ছন্ন প্রভাতের আবরণে পল্লীপ্রকৃতি ম্লানমুখে দেখা দিল। অল্প কিছুদূর যাইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

বাড়িতে গিয়া যখন পৌঁছিলাম, গৃহস্বামিনী তাঁহার আগুন-জ্বালা বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। বাড়িটি পুরাতন পাদ্রিনিবাস নহে। ইহা নূতন তৈরি। গৃহসংলগ্ন ভূমিখণ্ডে বৃদ্ধ তরুশ্রেণী বহুদিনের ধারাবাহিক মানবজীবনের বিলুপ্ত স্মৃতিকে পল্লবপুঞ্জের অস্ফুট ভাষায় মর্মরিত করিতেছে না। বাগানটি নূতন, বোধ হয় ইহারাই প্রস্তুত করিয়াছেন। ঘনসবুজ তৃণক্ষেত্রের ধারে ধারে বিচিত্র রঙের ফুল ফুটিয়া কাঙাল চক্ষুর কাছে অজস্র সৌন্দর্যের অবারিত অন্নসত্র খুলিয়া দিয়াছে। গ্রীষ্মঋতুতে ইংলণ্ডে ফুল-পল্লবের যেমন সরসতা ও প্রাচুর্য এমন তো আমি কোথাও দেখি নাই। এখানে মাটির উপরে ঘাসের আস্তরণ যে কী ঘন ও নিবিড় সবুজ, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

বাড়িটির ঘরগুলি পরিপাটি পরিচ্ছন্ন, লাইব্রেরি সুপাঠ্য গ্রন্থে পরিপূর্ণ; ভিতরে বাহিরে কোথাও লেশমাত্র অযত্নের চিহ্ন নাই। এখানকার ভদ্র গৃহস্থ-ঘরে এই জিনিসটাই বিশেষ করিয়া আমার মনে লাগিয়াছে। ইহাদের ব্যবহারের, আরামের ও গৃহসজ্জার উপকরণ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, অথচ ঘরের প্রত্যেক সামান্য জিনিসটির প্রতি গৃহস্থের চিত্ত সতর্কভাবে জাগ্রত আছে।

নিজের চারি দিকের প্রতি শৈথিল্য যে নিজেরই অবমাননা, তাহা ইহারা খুব বুঝে। এই জাগ্রত আত্মাদরের ভাবটি ছোটো বড়ো সকল বিষয়েই কাজ করিতেছে। ইহারা নিজের মনুষ্যগৌরবকে খাটো করিয়া দেখে না বলিয়াই নিজের ঘরবাড়িকে যেমন সর্ব-প্রযত্নে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি নিজের প্রতিবেশকে, সমাজকে, দেশকে সকল বিষয়ে সকল দিক হইতে সম্মার্জন করিয়া তুলিবার জন্য ইহাদের প্রয়াস অহরহ উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। ত্রুটি জিনিসটাকে ইহারা কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই মাপ করিতে চায় না।

বিকালের দিকে আমাকে লইয়া গৃহস্বামী উট্রম-সাহেব বেড়াইতে বাহির হইলেন। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে, কিন্তু আকাশে মেঘের অবকাশ নাই। এখানকার পুরুষেরা যেমন কালো টুপি মাথায় দিয়া মলিন বর্ণের কোর্তা পরিয়া বেড়ায়, এখানকার দেবতাও সেইরকম অত্যন্ত গম্ভীর ভদ্র বেশে আচ্ছন্ন হইয়া দেখা দিলেন। কিন্তু এই ঘন গাম্ভীর্যের ছায়াতলেও এখানকার পল্লীশ্রীর সৌন্দর্য ঢাকা পড়িল না। গুল্মশ্রেণীর বেড়ার দ্বারা বিভক্ত ঢেউ-খেলানো প্রান্তরের প্রগাঢ় শ্যামলিমা দুই চক্ষু স্নিগ্ধতায় অভিষিক্ত করিয়া দিল। জায়গাটা পাহাড়ে বটে, কিন্তু পাহাড়ের উগ্র বন্ধুরতা কোথাও নাই; আমাদের দেশের রাগিণীতে যেমন সুরের গায়ে সুর মীড়ের টানে ঢলিয়া পড়ে, এখানকার মাটির উচ্ছ্বাসগুলি তেমনি ঢালু হইয়া পরস্পর গায়ে গায়ে মিলিয়া রহিয়াছে; ধরিত্রীর সুরবাহারে যেন কোন্ দেবতা নিঃশব্দ রাগিণীতে মেঘমল্লারের গৎ বাজাইতেছেন।

আমাদের দেশের যেসকল প্রদেশ পার্বত্য সেখানকার যেমন একটা উদ্ধত মহিমা আছে, এখানে তাহা দেখা যায় না ; চারি দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, বন্যপ্রকৃতি এখানে সম্পূর্ণ পোষ মানিয়াছে। যেন মহাদেবের বাহন বৃষ—শরীরটি নধর চিক্কণ, নন্দীর তর্জনীসংকেত মানিয়া তাহার পায়ের কাছে শিঙ নামাইয়া শান্ত হইয়া পড়িয়া আছে, প্রভুর তপোবিঘ্নের ভয়ে হাম্বাধ্বনিও করিতেছে না।

পথে চলিতে চলিতে উট্রম-সাহেব একজন পথিকের সঙ্গে কিছু কাজের কথা আলাপ করিয়া লইলেন। ব্যাপারটা এই—স্থানীয় চাষী গৃহস্থদিগকে নিজেদের ভিটার চারি দিকে খানিকটা করিয়া বাগান করিতে উৎসাহ দিবার জন্য ইহারা একটি কমিটি করিয়া উৎকর্ষ অনুসারে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অল্পদিন হইল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই পথিকটি পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছে। উট্রম-সাহেব আমাকে কয়েকটি চাষী গৃহস্থের বাড়ি দেখাইতে লইয়া গেলেন। তাহারা প্রত্যেকেই নিজের কুটিরের চারি দিকে বহু যত্নে খানিকটা করিয়া ফুলের ও তরকারির বাগান করিয়াছে। ইহারা সমস্ত দিন মাঠের কাজে খাটিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া এই বাগানের কাজ করে। এমনি করিয়া গাছপালার প্রতি ইহাদের এমন একটা টান হয় যে, এই অতিরিক্ত পরিশ্রম ইহাদের গায়ে লাগে না। ইহার আর-একটি সুফল এই যে, এই উৎসাহে মদের নেশাকে খেদাইয়া রাখে। বাহিরকে রমণীয় করিয়া তুলিবার এই চেষ্টায় নিজের অন্তরকেও ক্রমশ সৌন্দর্যের সুরে বাঁধিয়া তোলা হয়। এখানকার পল্লীবাসীর সঙ্গে উট্রম-সাহেবের হিতানুষ্ঠানের

সম্বন্ধ আরও নানা দিক হইতে দেখিয়াছি। এইপ্রকার মঙ্গলব্রতে-নিয়ত-উৎসর্গ-করা জীবন যে কী সুন্দর তাহা ইঁহাকে দেখিয়া অনুভব করিয়াছি। ভগবানের সেবার অমৃতরসে ইঁহার জীবন পরিপক্ক মধুর ফলের মতো নম্র হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহার মধ্যে ইনি একটি পুণ্যের প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছেন; অধ্যয়ন ও উপাসনার দ্বারা ইঁহার গার্হস্থ্য প্রতিদিন ধৌত হইতেছে। ইঁহার আতিথ্য যে কিরূপ সহজ ও সুন্দর তাহা আমি ভুলিতে পারিব না।

জাহাজের খোল

কাগজে কী একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিদাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পুরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে।

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায়, কিন্তু জাহাজ চালায় না, বোধ করি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দিয়াশলাই-কাঠি জ্বালাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, দিয়াশলাই-কাঠি অনেক ঘর্ষণেও জ্বলে নাই ; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ছিল, কিন্তু সেই তাঁতের কল একটিমাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহার পরে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন ; সে খোল একদা ভর্তি হইয়া উঠিল, শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে, ঋণে এবং সর্বনাশে। কিন্তু তবু এ কথা মনে রাখিতে হইবে—এইসকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনও তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবি অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারম্বার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন ; সে বন্যা হঠাৎ

আসে এবং সে বন্যা হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতে দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে। তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতি বহন করিয়াই আসিয়াছেন মৃত্যুর পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।

এক দিকে বিলাতি কোম্পানি, আর-এক দিকে তিনি একলা —এই দুই পক্ষে বাণিজ্য-নৌযুদ্ধ ক্রমশই কিরূপ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল তাহা খুলনা-বরিশালের লোকেরা এখনও বোধ করি স্মরণ করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল—বরিশাল-খুলনার স্টিমার-লাইনে সত্যযুগ-আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনা ভাড়ায় যাতায়াত শুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল। ইহার উপরে বরিশালের ভলন্টিয়ারের দল স্বদেশী কীর্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রী-সংগ্রহে লাগিয়া গেল। সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না, কিন্তু আর সকলপ্রকার অভাবই বাড়িল বৈ কমিল না। অঙ্ক-শাস্ত্রের মধ্যে স্বদেশহিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না; কীর্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গণিত আপনার নামতা ভুলিতে পারিল না, সুতরাং তিন-ত্রিক্‌খে নয় ঠিক তালে

তালে ফড়িঙের মতো লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুগ্রহ এই যে, লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না; অথচ তাঁহারা যে চেনেন না এইটুকু মাত্র শিখিতে তাঁহাদের বিস্তর খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয়, এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের দ্বারা ইহজীবনেও ঘটে না। যাত্রীরা যখন বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার কর্মচারীরা যে তপস্বীর মতো উপবাস করিতেছিল, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই; অতএব যাত্রীদের জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কর্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার—সে তাঁহার এই সর্বস্বক্ষতিস্বীকার!

তখন খুলনা-বরিশালের নদীপথে প্রতিদিনের এই জয়-পরাজয়ের সংবাদ-আলোচনায় আমাদের উত্তেজনার অন্ত ছিল না। অবশেষে একদিন খবর আসিল, তাঁহার 'স্বদেশী'-নামক জাহাজ হাবড়ার ব্রিজে ঠেকিয়া ডুবিয়াছে। এইরূপে যখন তিনি তাঁহার নিজের সাধ্যের সীমা একেবারে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিলেন, নিজের পক্ষে কিছুই আর বাকি রাখিলেন না, তখনই তাঁহার ব্যাবসা বন্ধ হইয়া গেল।

উদ্যোগশিক্ষা

আমেরিকার এক মাসিক পত্রে দেখিলাম, সেখানকার একদল ছাত্রকে গাড়িতে করিয়া নানা জায়গায় লইয়া নানারকম কেজো শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রদিগকে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে দুধ দোহানো শিখানো হইতেছে, তাহার একটি ছবি প্রবন্ধের সঙ্গে দেখা গেল। শুধু গোষ্ঠবিদ্যা নয়, ফলের বাগান রাখা, যবের আটা দিয়া আধুনিক প্রণালীতে রুটি তৈরি করা, গমের আটার পরিবর্তে চিনাবাদাম ও রাঙা আলুর আটা ব্যবহার করা প্রভৃতি বিবিধ-প্রকার প্রয়োজনীয় তথ্য তাহাদিগকে পরীক্ষা-সহকারে শিখানো হইয়া থাকে।

যাহাতে হাতের ও চোখের দক্ষতা ও বস্তুপরিচয় ঘটে, আমাদের আশ্রমে ছেলেদের সেইরকম শিক্ষা দিবার জন্য বহুকাল হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। সেজন্য প্রায় মাঝে মাঝে অর্থসাধ্য আয়োজন করা গিয়াছে। সফলতা লাভ করিতে পারি নাই তাহার একমাত্র কারণ, পুঁথিগত বিদ্যায় আমাদিগকে কেবল যে অকর্মণ্য করিয়া দিয়াছে তাহা নহে, পুঁথির বাহিরে যাহা-কিছু আছে তাহার প্রতি ঔৎসুক্য চলিয়া গিয়াছে। বই পড়াইবার ক্লাস আমরা সহজে চালাইতে পারি, কিন্তু কেজো শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কী করিয়া করা যায় আমরা ভাবিয়া পাই না এবং এ সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা যায় না।

আশ্রমসম্পর্কীয় গোষ্ঠে আমরা মুলতানী গাভী আনাইয়া-

ছিলাম। বাঙালি গোয়ালা সেই গাই দুহিতে পারে না। যে কয়জন হিন্দুস্থানি গোয়ালা আছে, দুধ দোহা সম্বন্ধে তাহাদেরই প্রতি আজও আমাদের নির্ভর। আজ দশ বছরের উপর হইল আশ্রমসম্পর্কে গোষ্ঠ আছে, কিন্তু এতদিনেও কোনো ছেলে দুধ দুহিতে শিখে নাই, অথবা গোরু সম্বন্ধে কোনো ঔৎসুক্য বোধ করে নাই—এ কেবল আমাদের দেশেই সম্ভব। মনের এই নির্জীবতা নিতান্ত অল্প বয়স হইতেই আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায়।

আশ্রমে যে সব্‌জির বাগান আছে সেই বাগানে নিজে ইচ্ছা করিয়া ছাত্রদিগকে যোগ দিতে দেখিলাম না। ফুটবল প্রভৃতি খেলার উত্তেজনা তাহাদের যথেষ্ট আছে, কিন্তু ফসল ফলানোর কাজে দেহমনের যে স্বাভাবিক আনন্দ আছে সেই আনন্দ হইতে আমাদের ছেলেরা বঞ্চিত। আমাদের বয়স্কমণ্ডলীরও অধিকাংশের সেই দশা।

রান্নাঘরে চুলার যে সাবেক ব্যবস্থা আছে, সকলেই জানেন, তাহাতে যেমন দুঃখ বেশি তেমনি ব্যয়ও বেশি এবং তাহাতে রান্নাঘর যথোচিত পরিষ্কার রাখা দুঃসাধ্য। আধুনিক প্রণালীতে চুলা নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়তা-বশত পাচকের তাহা ভালো লাগিল না। তাহারা নানা ছুতা করিয়া সেই চুলা বর্জন করিল। ইহাতে রান্নাঘরের দুঃখ-তাপ পূর্ববৎ প্রবল হইয়া উঠিল। আমরাও ইহা সহিয়া গেলাম; নূতন প্রণালীর দায় কেহ গ্রহণ করিলাম না, নূতন করিয়া চিন্তা করিলাম না।

আমেরিকার পত্রে দেখিলাম, চিনাবাদামের আটা ব্যবহার করিয়া সুলভ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত করা সম্বন্ধে সেখানকার সকলে ভাবিতেছে; অথচ আমাদের তুলনায় সেখানে খাদ্যের অভাব নাই, পুষ্টির অভাবে যে সে দেশের লোকে বিশেষ দুর্বল হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি না—কিন্তু সেখানে মানুষের মন নিত্যই উদ্যমশীল। আরও সুবিধা, আরও উৎকর্ষের প্রয়াস তাহাদিগকে নিয়ত নূতন অধ্যবসায়ে নিযুক্ত করিতেছে। দেহের পুষ্টিও আমাদের নাই, অন্নের অভাবও আমাদের নিত্য লাগিয়া আছে, অথচ যখনই সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি তখনই পুরানো রাস্তা ছাড়া অন্য পথ চোখেই পড়ে না। সে পথ দুর্গম হইয়া উঠিলেও ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই দিকেই মন যায়। যাহা-কিছু চলিয়া আসিতেছে তাহা নিঃসন্দেহই ভালো বলিয়াই চলিয়া আসিতেছে, এই জড় বিশ্বাস আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন হইতে কিছুতেই তাড়ানো যায় না। সকল সভ্য দেশেই আরও-ভালোর রাস্তায় লোক চলিতেছে, আমাদের দেশে সে রাস্তা বন্ধ। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, এ দেশের যাহা-কিছু পরিবর্তন প্রায় সমস্তই বাহিরের তাড়নায় হইতেছে, তাহাতে আমাদের অন্তরের সম্মতি নাই। ইহা আমাদের অন্তরতম দাসত্বেরই লক্ষণ। আমরা ঠেলা খাইয়াই চলিব, নিজে চলিব না। সুতরাং সেই চলিবার যানবাহনও আসে বাহির হইতে। আজকাল দেশে আখ-মাড়াইয়ের যে কল চলিতেছে তাহাতে এঞ্জিনিয়ারিং অতি সামান্য, কিন্তু তবু তাহা যে একজন সামান্য ইংরেজ এঞ্জিনিয়ারের

অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, ইহাতেই আমাদের অন্তরের জড়তা সপ্রমাণ হয়। আজ আমাদের লোহা-ঢালাইয়ের কারখানায় সেই যন্ত্রেরই নিরন্তর নকল চলিতেছে। আরও যুগ-যুগান্তর চলিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আর-একজন এঞ্জিনিয়ার আসিয়া আমাদের আখের রস পিষিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে লাখো লাখো টাকা আমাদের দেশ হইতে দুহিয়া লইয়া সমুদ্রপারে না যাইবে।

আমাদের আশ্রমেও দেখিতে পাই, ক্লাসের কাজ প্রভৃতি যে-সকল বাঁধা কাজ আছে তাহাকে রক্ষা করিয়া চলিবার দিকে সতর্কতার অভাব নাই; কিন্তু অন্যান্য ব্যবহারে কত দেখিবার, কত ভাবিবার, কত করিবার আছে, আমাদের সে দিকে মন যায় না। পড়াশুনার ত্রুটিকেই আমরা একমাত্র ত্রুটি মনে করি, কেননা সেটা আমাদের বাঁধা অভ্যাস। উন্নতির যে অন্ত নাই এবং সকল বাধাকেই যে অতিক্রম করিতে হইবে, এ বিশ্বাস ও ভরসা না থাকিলে কেবল বই পড়িয়া আমরা বাঁচিব না।

কোনো অনুষ্ঠানের সংকল্প মনে উদয় হইলেই মানসিক জড়তা-বশত আমরা গোড়াতেই ভাবি, বিস্তর টাকা না হইলে সেসকল অনুষ্ঠানের পত্তন হইতেই পারে না। তার পরে টাকা যখন আসে তখন দেখি, টাকায় সফলতা লাভ করা যায় না, মানুষের মনটাই আসল। সেইরূপ দেখা যায়, যখনই স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি কোনো বিষয়ে ব্যবস্থার লেশমাত্র পরিবর্তন দরকার হয় তখনই সব-প্রথমে আমরা মনে করি, টাকা নহিলে কিছুতেই হইবে না। নিজের মনের চেয়ে যখন টাকাটাকে বেশি বলিয়া মনে হয় তখন মন

নিরুদ্যম থাকে। সেই নিরুদ্যম মন টাকা পাইলেও, হয় কিছুই করে না, না-হয় প্রচুর অপব্যয় করিয়া অল্প ফল পায়। যে সংগতি আছে তাহা লইয়াই কী করা যাইতে পারে চেষ্টা করিয়া দেখা যাক না, মনের এই আত্মনির্ভরের শিক্ষাটাই আমাদের দেশে, কি অর্থের তরফ হইতে, কি চরিত্রের তরফ হইতে, সকল শিক্ষা হইতে বড়ো—এ কথা যেন আমরা কোনোমতেই না ভুলি।

দেবীর বলি

ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য রাজ্যে জীবহিংসা নিষেধ করিয়া দেন। দেবীমন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি রাজার এই আদেশকে অন্যায় ও ব্রাহ্মণের অধিকারে অযথা হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করেন এবং রাজাকে মন্দিরে বলি বন্ধ না করিতে অনুরোধ করেন। রাজা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিলে, ক্রুদ্ধ রঘুপতি রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং 'বলি বন্ধ হওয়ায় দেবী বিমুখ হইয়াছেন' এই বলিয়া প্রচার করেন। মূঢ় অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণ ভীত হইয়া রাজার প্রতি বিরূপ হয়; তখন তিনি সিংহাসনলুব্ধ রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে 'রাজরক্ত না হইলে দেবীর তৃপ্তি হইবে না' এই কথা বুঝাইয়া রাজাকে হত্যা করিবার প্ররোচনা দেন। নক্ষত্ররায়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে রঘুপতি দেবীমন্দিরের ভক্ত সেবক কিশোরবয়স্ক রাজপুত জয়সিংহকে সেই কার্যে উৎসাহিত করেন। জয়সিংহ গুরু রঘুপতিকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তিনি অন্যায় জানিয়াও গুরুর আদেশে রাজরক্ত আনিবেন শপথ করেন, কিন্তু শেষে নিরপরাধ ও স্নেহপরায়ণ রাজাকে হত্যা না করিয়া নিজের রক্ত দিয়া দেবীর তৃষ্ণা মিটাইবেন ইহাই সংকল্প করেন। ইহার পরের ঘটনা এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইল।

চতুর্দশী তিথি। চাঁদও উঠিয়াছে। আকাশের কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার। কখনও চাঁদ বাহির হইতেছে, কখনও চাঁদ লুকাইতেছে। গোমতী-তীরের অরণ্যগুলি চাঁদের দিকে চাহিয়া

তাহাদের গভীর অন্ধকাররাশির মর্ম ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে নিশ্বাস ফেলিতেছে।

আজ রাত্রে পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। রাত্রে পথে লোক কেই-বা বাহির হয়। কিন্তু নিষেধ আছে বলিয়া পথের বিজনতা আজ আরও গভীর বোধ হইতেছে। নগরবাসীরা সকলেই আপনার ঘরের দীপ নিভাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। পথে একটি প্রহরী নাই। চোরও আজ পথে বাহির হয় নাই। যাহারা শ্মশানে শবদাহ করিতে যাইবে তাহারা মৃতদেহ ঘরে লইয়া প্রভাতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ঘরে যাহাদের সন্তান মুমূর্ষু তাহারা বৈদ্য ডাকিতে বাহির হয় না। যে ভিক্ষুক পথপ্রান্তে বৃক্ষতলে শয়ন করিত সে আজ গৃহস্থের গোশালায় আশ্রয় লইয়াছে।

সে রাত্রে শৃগাল কুকুর নগরের পথে পথে বিচরণ করিতেছে, দুই-একটা চিতাবাঘ গৃহস্থের দ্বারের কাছে আসিয়া উঁকি মারিতেছে। মানুষের মধ্যে কেবল একজন মাত্র আজ গৃহের বাহিরে আছে— আর মানুষ নাই। সে একখানা ছুরি লইয়া নদীতীরে পাথরের উপর শান দিতেছে এবং অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবিতেছে। ছুরির ধার যথেষ্ট ছিল; কিন্তু সে বোধ করি ছুরির সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাতেও শান দিতেছিল, তাই তার শান-দেওয়া আর শেষ হইতেছিল না। প্রস্তরের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ ছুরি হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া হিংসার লালসায় তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার নদী বহিয়া যাইতেছিল। জগতের উপর দিয়া অন্ধকার রজনীর প্রহর বহিয়া যাইতেছিল। আকাশের উপর দিয়া অন্ধকার ঘন মেঘের স্রোত

ভাসিয়া যাইতেছিল।

অবশেষে যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল তখন জয়সিংহের চেতনা হইল।

তপ্ত ছুরি খাপের মধ্যে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পূজার সময় নিকটবর্তী হইয়াছে। তাঁহার শপথের কথা মনে পড়িয়াছে। আর এক দণ্ডও বিলম্ব করিলে চলিবে না।

মন্দির আজ সহস্র দীপে আলোকিত। ত্রয়োদশ দেবতার মাঝে কালী দাঁড়াইয়া নররক্তের জন্য জিহ্বা মেলিয়াছেন। মন্দিরের সেবকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া চতুর্দশ দেব-প্রতিমা সম্মুখে করিয়া রঘুপতি একাকী মন্দিরে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে এক দীর্ঘ খড়্গ। উলঙ্গ উজ্জ্বল খড়্গ দীপালোকে বিভাসিত হইয়া স্থিরবজ্রের ন্যায় দেবীর আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

অর্ধরাত্রে পূজা। সময় নিকটবর্তী। রঘুপতি অত্যন্ত অস্থির চিত্তে জয়সিংহের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। সহসা ঝড়ের মতো বাতাস উঠিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। বাতাসে মন্দিরের সহস্র দীপশিখা কাঁপিতে লাগিল, উলঙ্গ খড়্গের উপর বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। চতুর্দশ দেবতা এবং রঘুপতির ছায়া যেন জীবন পাইয়া দীপশিখার নৃত্যের তালে তালে মন্দিরের ভিত্তিময় নাচিতে লাগিল। একটা নরকপাল ঝড়ের বাতাসে ঘরময় গড়াইতে লাগিল। মন্দিরের মধ্যে দুইটা চামচিকা আসিয়া শুষ্ক পত্রের মতো ক্রমাগত উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল—দেয়ালে তাহাদের ছায়া উড়িতে লাগিল।

দ্বিপ্রহর হইল। প্রথমে নিকটে, পরে দূর-দূরান্তরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। ঝড়ের বাতাসও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া হূ হূ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পূজার সময় হইয়াছে। রঘুপতি অমঙ্গল-আশঙ্কায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

এমন সময় জীবন্ত ঝড়বৃষ্টি-বিদ্যুতের মতো জয়সিংহ নিশীথের অন্ধকারের মধ্য হইতে সহসা মন্দিরের আলোকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘ চাদরে দেহ আচ্ছাদিত, সর্বাঙ্গ বহিয়া বৃষ্টিধারা পড়িতেছে, নিশ্বাস বেগে বহিতেছে, চক্ষুতারকায় অগ্নিকণা জ্বলিতেছে।

রঘুপতি তাহাকে ধরিয়া কানের কাছে মুখ দিয়া কহিলেন, "রাজরক্ত আনিয়াছিস?"

জয়সিংহ তাঁহার হাত ছাড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, "আনিয়াছি। রাজরক্ত আনিয়াছি! আপনি সরিয়া দাঁড়ান, আমি দেবীকে নিবেদন করি।"

শব্দে মন্দির কাঁপিয়া উঠিল।

কালীর প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "সত্যই কি তবে তুই সন্তানের রক্ত চাস মা। রাজরক্ত নহিলে তোর তৃষ্ণা মিটিবে না? জন্মাবধি আমি তোকেই মা বলিয়া আসিয়াছি, আমি তোরই সেবা করিয়াছি, আমি আর-কাহারও দিকে চাই নাই, আমার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আমি রাজপুত, আমি ক্ষত্রিয়, আমার প্রপিতামহ রাজা ছিলেন; আমার মাতামহবংশীয়েরা আজও রাজত্ব করিতেছেন। এই নে তবে তোর

সন্তানের রক্ত, তোর রাজরক্ত এই নে !”

গাত্র হইতে চাদর পড়িয়া গেল। কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির করিলেন— বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিল— চকিতের মধ্যে সেই ছুরি আমূল তাঁহার হৃদয়ে নিহিত করিলেন। মরণের তীক্ষ্ণ জিহ্বা তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। প্রতিমার পদতলে পড়িয়া গেলেন ; পাষাণপ্রতিমা বিচলিত হইল না।

রঘুপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন— জয়সিংহকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন, তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া রহিলেন। রক্ত গড়াইয়া মন্দিরের শ্বেত প্রস্তরের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দীপগুলি একে একে নিবিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত রাত্রি একটি প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় ঝড় থামিয়া চারি দিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল। রাত্রি চতুর্থ প্রহরের সময় মেঘের ছিদ্র দিয়া চন্দ্রালোক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দ্রালোক জয়সিংহের পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর পড়িল— চতুর্দশ দেবতা শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। প্রভাতে বন হইতে যখন পাখি ডাকিয়া উঠিল তখন রঘুপতি মৃতদেহ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

আহারের অভ্যাস

এক সময়ে বাংলাদেশে খাদ্যের অভাব ছিল না। ডাল ভাত মাছ শাক ঘি দুধ প্রচুর পরিমাণে মিলিত— তাহাতে দেশের শরীরপোষণ সহজ হইয়াছিল। তা ছাড়া তখন কাজের পরিমাণ ও উদ্‌বেগ কম ছিল।

সকলেই জানেন, আজকাল পাড়াগাঁয়েও দুধ ঘি যথেষ্ট মেলে না। যে-সকল জায়গায় নদীতে মাছ ধরা হয় সেখানেও মাছ পাওয়া দুর্লভ; কারণ, শহরে মাছ চালান হয়। ঘিয়ে অখাদ্য জিনিস ভেজাল দেওয়া হয় বলিয়া ঘি অপথ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই আমাদের খাদ্যপদার্থের যে ভাগটা এখন বাকি আছে তাহাতে পুষ্টিকরতা অতি সামান্য। শাক-সব্‌জি লাউ কুমড়া থোড় মোচা প্রভৃতির সঙ্গে মসলা মিশাইয়া যে-সকল ব্যঞ্জন তৈরি হয় তাহাতে পেট ভরিলেও শরীরের উপবাসদশা ঘোচে না।

ইহাতে ফল হইয়াছে এই যে, এক কালে জীবনীশক্তির সতেজতার জোরে যে-সকল রোগের আক্রমণ আমরা নিরস্ত করিতে পারিতাম, এখন তাহা পারি না। পুষ্টির অভাবে শরীর নির্জীব হইয়া আছে বলিয়াই নানাপ্রকার রোগের হাতে আমরা হার মানিতেছি এবং মরিতেছি।

তাই আজও যে-সকল খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ আছে তাহাদের পুষ্টিকরতা বিচার করিয়া বাছাই করিয়া লওয়া এখন আমাদের

কর্তব্য। এক কালে যে-সব খাদ্য প্রধান খাদ্যের পারিপার্শ্বিক মাত্র ছিল এখন তাহারাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; ইহাতে কেবলমাত্র আমাদের অভ্যাসকেই তুষ্ট করিয়া শরীরকে হনন করা চলিতেছে। শুধু তাই নয়, পূর্বে আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় ছিল, তাই নানাপ্রকার তরকারি রাঁধিবার আয়োজন তখন সহজেই হইত। এখন তেমন বিচিত্র আয়োজনে পাত সাজাইবার যোগাড় করিতে যে সময় ও উদ্যোগ খরচ করা হইতেছে সেটার মতো অপব্যয় আর নাই। কিন্তু আমাদের অভ্যাসকে প্রশ্রয় না দিলে আমাদের রুচি তৃপ্ত হয় না বলিয়া এত অত্যাচার সহ্য করিতে হয়।

অত্যাচার যে কত তাহা আশ্রমের পাকশালার দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়। মাদ্রাজে, উত্তর-পশ্চিমে, যেখানেই আমরা কোনো আশ্রমের আহারব্যবস্থার সন্ধান লইয়াছি সেখানেই দেখা গিয়াছে, সে-সকল জায়গায় খাদ্যের বৈচিত্র্য কম অথচ পোষণকারিতা বেশি বলিয়া ব্যবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক সহজ। আমাদের দেশের ছোটো ছোটো ব্যঞ্জনের জন্য বাটনা বাঁটিতে, কুটনো কুটিতে এবং রান্না শেষ করিতে কত লোককে বৃথা গলদ্‌ঘর্ম হইতে হয়— আর, এইরূপ তুচ্ছ খাদ্যের বৈচিত্র্য যত বেশি হয় তাহার আবর্জনাও তত বেশি হয়। বড়ো বড়ো আশ্রমের পক্ষে ইহার অসুবিধা যে কত প্রচুর তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। তা ছাড়া, এই-সকল তুচ্ছ উপকরণের তারতম্য লইয়া যত নালিশ, যত আক্ষেপ! বাংলাদেশে এরূপ সাধারণ-পাকশালার ম্যানেজারের মতো কৃপাপাত্র জীব আর জগতে নাই।

পোষণ-গুণ বিচার করিয়া আহার-ব্যবস্থা বাঁধিয়া দিবার প্রধান অন্তরায় রসনার গোঁড়ামি। অভ্যাসের ব্যতিক্রম হইলে যেন আহার হইলই না এরূপ বোধ হয়। সেইজন্য আমাদের দেশে অনেকে যেদিন একাদশী করেন সেইদিনই আহারটা গুরুতর হয়; সেদিন ভাত ছাড়িয়া রুটি প্রভৃতি খাইয়া মনে করেন, তাঁহারা উপবাস করিলেন।

এই সমস্যা সকল দেশেই আছে। ভাত যে একটা খাদ্য আমেরিকার লোককে এ কথা বোঝানোই শক্ত। সেখানে ক্যারোলিনা প্রভৃতি দেশে ধান জন্মাইবার উপযুক্ত জমি অনেক ছিল। ভাতের প্রতি আমেরিকানদের বিতৃষ্ণা-বশতঃ সে-সকল জমিতে অন্য কোনো লাভজনক ফসল জন্মাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এ দিকে যুদ্ধের সময় যখন য়ুরোপে আহার্যসামগ্রীর বড়োই টানাটানি পড়িয়াছিল তখন আমেরিকা হইতে ভুট্টা আমদানি করিয়া দেখা গেল— ইংরেজ বা বেল্‌জিয়ান ভুট্টা সহজে খাইতে চায় না। অবশেষে বারো-আনা পরিমাণ ভুট্টার ময়দার সঙ্গে সিকি-পরিমাণ গমের ময়দা মিশাইয়া রুটি তৈরি করিয়া ইহাদের আহারের যোগাড় করা হয়।

এই রসনার গোঁড়ামি বাঙালির ছেলেরও অত্যন্ত প্রবল; তাহার উপর বাঙালি তার্কিক; এইজন্য, বাঙালির প্রচলিত খাদ্যই যে বাংলাদেশের জলবায়ুর বিশেষ উপযোগী এই তর্কের দ্বারা তাহারা নিজের রুচির সমর্থন করে। একটা কথা ভুলিয়া যায় যে, তাহাদের চিরন্তন খাদ্যতালিকার কয়েকটি প্রধান অঙ্গ কম পড়িয়াছে

এবং বিকৃত হইয়াছে ; অতএব সেটা পূরণ করিবার উপায় বাহির করিতে এবং তদনুসারে আহারের রুচি তৈরি করিতে হইবে, নহিলে 'মরণং ধ্রুবং'। সেই মৃত্যু শুরু হইয়াছে, কেবল সেটা ছদ্মবেশে চলিতেছে বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। বস্তুতঃ, আমাদের উপবাসই নানা রোগের ছদ্মবেশ লইয়া আমাদিগকে মারিতেছে।

দান-প্রতিদান

বড়োগিন্নি যে কথাগুলি বলিয়া গেলেন তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। যে হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন তাহার চিত্তপুত্তলি একেবারে জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল।

বিশেষতঃ, কথাগুলি তাঁহার স্বামীর উপর লক্ষ করিয়া বলা— এবং স্বামী রাধামুকুন্দ তখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনতিদূরে বসিয়া তাম্বুলের সহিত তাম্রকূটধূম সংযোগ করিয়া খাদ্যপরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগুলি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত করিল এমন বোধ হইল না। অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত তাম্রকূট নিঃশেষ করিয়া অভ্যাসমত যথাকালে তিনি শয়ন করিতে গেলেন।

রাসমণি যখন আসিয়া ক্রন্দনাবেগে শয্যাতল কম্পান্বিত করিয়া তুলিলেন তখন রাধামুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।"

রাসমণি উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন, "শোন নাই কি।"

রাধামুকুন্দ। শুনিয়াছি। কিন্তু বউঠাকরুন একটা কথাও তো মিথ্যা বলেন নাই! আমি কি দাদার অন্নেই প্রতিপালিত নহি। তোমার এই কাপড়চোপড় গহনাপত্র এ-সমস্ত আমি কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি। যে খাইতে-পরিতে দেয় সে যদি দুটো কথা বলে তাহাও খাওয়া-পরার শামিল করিয়া লইতে হয়।

"এমন খাওয়া-পরায় কাজ কী।"

"বাঁচিতে তো হইবে!"

"মরণ হইলেই ভালো হয়।"

"যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করো, আরাম বোধ করিবে।"

বলিয়া রাধামুকুন্দ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধামুকুন্দ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে, নিতান্ত নিকটসম্পর্কও নয়; প্রায় গ্রামসম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নহে। বড়োগিন্নি ব্রজসুন্দরীর সেটা কিছু অসহ্য বোধ হইত। বিশেষতঃ, শশিভূষণ দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে ছোটোবউয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরঞ্চ, যে জিনিসটা নিতান্ত একজোড়া না মিলিত সেটা গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া ছোটো-বউকেই দিতেন। তাহা ছাড়া অনেক সময়ে তিনি স্ত্রীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধামুকুন্দের পরামর্শের প্রতি বেশি নির্ভর করিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ লোকটা নিতান্ত ঢিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ এবং বিষয়কর্মের সমস্ত ভার রাধামুকুন্দের উপরেই ছিল। বড়োগিন্নির সর্বদাই সন্দেহ, রাধামুকুন্দ তলে তলে তাঁহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে— তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না, রাধার প্রতি

তাঁহার বিদ্বেষ ততই বাড়িয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগুলোও অন্যায় করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। এইজন্য তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাহাদের প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞা-প্রকাশ-পূর্বক নিজের সন্দেহকে ঘরে বসিয়া দ্বিগুণ দৃঢ় করিতেন। তাঁহার এই বহুযত্নপোষিত মানসিক আগুন আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভূমিকম্প-সহকারে প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণ ভাষায় উচ্ছ্বসিত হইত।

রাত্রে রাধামুকুন্দের ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি বিরসমুখে শশিভূষণের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। শশিভূষণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, "রাধু, তোমায় এমন দেখিতেছি কেন। অসুখ হয় নাই তো ?"

রাধামুকুন্দ মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, আর তো আমার এখানে থাকা হয় না।" এই বলিয়া গত সন্ধ্যাকালে বড়ো-গৃহিণীর আক্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে এবং শান্তভাবে বর্ণনা করিলেন।

শশিভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "এই ! এ তো নূতন কথা নহে। ও তো পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই দুটো কথা বলিবে। তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কথা আমাকেও তো মাঝে মাঝে শুনিতে হয়, তাই বলিয়া তো সংসার ত্যাগ করিতে পারি না।"

রাধা কহিলেন, "মেয়েমানুষের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে পুরুষ হইয়া জন্মিলাম কী করিতে। কেবল ভয় হয়, তোমার সংসারে পাছে অশান্তি ঘটে।"

শশিভূষণ কহিলেন, "তুমি গেলে আমার কিসের শান্তি।"

আর অধিক কথা হইল না। রাধামুকুন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ভার সমান রহিল।

এ দিকে বড়োগৃহিণীর আক্রোশ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। সহস্র উপলক্ষে যখন-তখন তিনি রাধাকে খোঁটা দিতে পারিলে ছাড়েন না ; মুহুর্মুহু বাক্যবাণে রাসমণির অন্তরাত্মাকে একপ্রকার শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। রাধা যদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্ত্রীকে ক্রন্দনোন্মুখী দেখিবামাত্র চোখ বুজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তবু ভাবে বোধ হয় তাঁহারও অসহ্য হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু শশিভূষণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক তো আজিকার নহে। দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্তাভাত খাইয়া পাততাড়ি কক্ষে একসঙ্গে পাঠশালায় যাইত, উভয়ে যখন একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পালাইয়া রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শুইয়া স্তিমিত আলোকে মাসির নিকট গল্প শুনিত, ঘরের লোককে লুকাইয়া রাত্রে দূরপল্লীতে যাত্রা শুনিতে যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাস্তি উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত— তখন কোথায় ছিল ব্রজসুন্দরী, কোথায় ছিল রাসমণি। জীবনের এতগুলো দিনকে কি এক দিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু এই বন্ধন যে স্বার্থপরতার বন্ধন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরান্নপ্রত্যাশার সুচতুর ছদ্মবেশ, এরূপ সন্দেহ, এরূপ

আভাসমাত্র তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত ; অতএব আর কিছুদিন এরূপ চলিলে কী হইত বলা যায় না। কিন্তু এমন সময়ে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে আজ চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার কথা। তখন নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে গবর্মেণ্টের খাজনা শোধ না করিলে জমিদারি-সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত।

একদিন খবর আসিল, শশিভূষণের জমিদারি পরগনা এনাৎশাহী লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে।

রাধামুকুন্দ তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু প্রশান্ত ভাবে কহিলেন, "আমারই দোষ।" শশিভূষণ কহিলেন, "তোমার কিসের দোষ। তুমি তো খাজনা চালান দিয়াছিলে, পথে যদি ডাকাত পড়িয়া লুটিয়া লয়, তুমি তাহার কী করিতে পার।"

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোনো ফল নাই, এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষণ হঠাৎ যে কোনো কাজকর্মে হাত দিবেন সেরূপ তাঁহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া এক মুহূর্তে ডুব-জলে গিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই তিনি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে উদ্যত হইলেন। রাধামুকুন্দ এক-থলে টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি পূর্বেই নিজ স্ত্রীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা মহৎ পরিবর্তন দেখা গেল ; সম্পৎকালে গৃহিণী

যাহাকে দূর করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিপৎকালে তাহাকে ব্যাকুলভাবে অবলম্বন করিয়া ধরিলেন। এই সময়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে কাহার উপর অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কখনও যে রাধামুকুন্দের প্রতি তাঁহার তিলমাত্র বিদ্বেষভাবে ছিল, এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধামুকুন্দ পূর্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। নিকটবর্তী শহরে তিনি মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন মোক্তারি-ব্যবসায়ে আয়ের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানী রাধামুকুন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিলেন। ক্রমে তিনি জেলার অধিকাংশ বড়ো বড়ো জমিদারের কার্যভার গ্রহণ করিলেন।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা পূর্বের ঠিক বিপরীত। এখন রাসমণির স্বামীর অন্নেই শশিভূষণ ও ব্রজসুন্দরী প্রতিপালিত। সে কথা লইয়া তিনি স্পষ্ট কোনো গর্ব করিয়াছিলেন কি না জানি না। কিন্তু কোনো একদিন বোধ করি আভাসে ইঙ্গিতে ব্যবহারে সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, বোধ করি দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং হাত দুলাইয়া কোনো একটি বিষয়ে বড়োগিন্নির ইচ্ছার প্রতিকূলে নিজের মনোমত কাজ করিয়াছিলেন— কিন্তু সে কেবল একটি দিন মাত্র; তাহার পরদিন হইতে তিনি যেন পূর্বের অপেক্ষা নম্র হইয়া গেলেন। কারণ, কথাটা তাঁহার স্বামীর কানে গিয়াছিল; এবং রাত্রে রাধামুকুন্দ কী কী যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন ঠিক

বলিতে পারি না, পরদিন হইতে তাঁহার মুখে আর রা রহিল না, বড়োগিন্নির দাসীর মতো হইয়া রহিলেন। শুনা যায়, রাধামুকুন্দ সেই রাত্রেই স্ত্রীকে তাঁহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং সপ্তাহকাল তাঁহার মুখদর্শন করেন নাই। অবশেষে ব্রজসুন্দরী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্পতির মিলন সাধন করাইয়া দেন এবং বলেন, "ছোটোবউ তো সেদিন আসিয়াছে, আর আমি কত কাল হইতে তোমাদের ঘরে আছি। ভাই, তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্ক তাহার মর্যাদা ও কি বুঝিতে শিখিয়াছে। ও ছেলেমানুষ, উহাকে মাপ করো।"

রাধামুকুন্দ সংসার-খরচের সমস্ত টাকা ব্রজসুন্দরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আবশ্যক ব্যয় নিয়ম-অনুসারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে পাইতেন। গৃহমধ্যে বড়োগিন্নির অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভাল বৈ মন্দ নহে; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, শশিভূষণ স্নেহবশে এবং নানা বিবেচনায় রাসমণিকে বরঞ্চ অনেক সময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভূষণের মুখে যদিও তাঁহার সহজ প্রফুল্ল হাস্যের বিরাম ছিল না, কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কৃশ হইয়া যাইতেছিলেন। আর-কেহ ততটা লক্ষ্য করে নাই, কেবল দাদার মুখ দেখিয়া রাধার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেক সময়ে গভীর রাত্রে রাসমণি জাগ্রত হইয়া দেখিতেন, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অশান্তভাবে রাধা এপাশ-ওপাশ করিতেছেন।

রাধামুকুন্দ অনেক সময় শশিভূষণকে গিয়া আশ্বাস দিতেন, “তোমার কোনো ভাবনা নাই দাদা। তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব, কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। বেশি দিন দেরিও নাই।”

বাস্তবিক বেশি দিন দেরিও হইল না। শশিভূষণের সম্পত্তি যে ব্যক্তি নিলামে খরিদ করিয়াছিল সে ব্যবসায়ী লোক, জমিদারির কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল ; কিন্তু ঘর হইতে সদর-খাজনা দিতে হইত, এক পয়সা মুনফা পাইত না। রাধামুকুন্দ বৎসরের মধ্যে দুই-একবার লাঠিয়াল লইয়া লুটপাট করিয়া খাজনা আদায় করিয়া আনিতেন। প্রজারাও তাঁহার বাধ্য ছিল। ব্যাবসাজীবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত, এবং রাধামুকুন্দের পরামর্শে ও সাহায্যে সর্বপ্রকারেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারা বিস্তর মকদ্দমা মামলা করিয়া, বারম্বার অকৃতকার্য হইয়া, এই ঝঞ্ঝাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সামান্য মূল্যে রাধামুকুন্দ সেই পূর্বসম্পত্তি পুনর্বার কিনিয়া লইলেন।

লেখায় যত অল্প দিন মনে হইল আসলে ততটা নয়। ইতিমধ্যে প্রায় দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে শশিভূষণ যৌবনের সর্বপ্রান্তে প্রৌঢ় বয়সের আরম্ভভাগে ছিলেন, কিন্তু এই

আট-দশ বৎসরের মধ্যেই তিনি যেন অন্তররুদ্ধ মানসিক উত্তাপের বাষ্পযানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন তখন, কী জানি কেন, আর তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। বহুদিন অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযন্ত্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বাঁধিলেও ঢিলা হইয়া নামিয়া যায়— সে সুর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধামুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী বল' ভাই।"

রাধামুকুন্দ বলিলেন, "অবশ্য, শুভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বৈ কি।"

গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোটো বড়ো সকলেই খাইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা এবং দুঃখী-কাঙালগণ পয়সা ও কাপড় পাইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরম্ভে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল, তাহার উপরে শশিভূষণ পরিবেশনাদি বিবিধ কার্যে তিন-চারি দিন বিস্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্ন শরীরে আর সহিল না— তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দুরূহ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল; বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল, "বড়ো শক্ত ব্যাধি।"

রাত্রি দুই-তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে

বাহির করিয়া দিয়া রাধামুকুন্দ কহিলেন, "দাদা, তোমার অবর্ত-মানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কিরূপ দিব সেই উপদেশ দিয়া যাও।"

শশিভূষণ কহিলেন, "ভাই, আমার কী আছে যে কাহাকেও দিব।"

রাধামুকুন্দ কহিলেন, "সবই তো তোমার।"

শশিভূষণ উত্তর দিলেন, "এক কালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।"

রাধামুকুন্দ অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বসিয়া বসিয়া শয্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বার বার সমান করিয়া দিতে লাগিলেন। শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ তখন শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর পা-দুটি ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি তাহা তোমাকে বলি, আর তো সময় নাই।"

শশিভূষণ কোনো উত্তর করিলেন না। রাধামুকুন্দ বলিয়া গেলেন, সেই স্বাভাবিক শান্ত ভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে লাগিল— "দাদা, আমার ভালো করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে তো হয়তো তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক

প্রভেদ ছিল— তুমি ধনী, আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম সেই সামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে তখন আমিই সে প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদর খাজনা লুট করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।”

শশিভূষণ তিলমাত্র বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে রুদ্ধ উচ্চারণে কহিলেন, “ভাই, ভালোই করিয়াছিলে। কিন্তু যে জন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল। কাছে কি রাখিতে পারিলে। দয়াময় হরি।”— প্রশান্ত মৃদু হাস্যের উপরে দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাধামুকুন্দ তাঁহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া কহিলেন, “দাদা, আমাকে মাপ করিলে তো?”

শশিভূষণ কাছে ডাকিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন, “ভাই, তবে শোনো। এ কথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তুমি যাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।”

রাধামুকুন্দ দুই করতলে লজ্জিত মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে কহিলেন, “দাদা, মাপ যদি করিয়াছ তবে তোমার এই সম্পত্তি তুমি গ্রহণ করো। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়ো না।”

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছে— রাধামুকুন্দের মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হাত তুলিলেন। তাহাতে কী বুঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধামুকুন্দ বুঝিয়া থাকিবেন।

ছোটোনাগপুর

রাত্রে হাবড়ায় রেলগাড়িতে চড়িলাম। গাড়ির ঝাঁকানিতে নাড়া খাইয়া ঘুমটা যেন ঘোলাইয়া যায়। চেতনায় ঘুমে, স্বপ্নে জাগরণে খিচুড়ি পাকাইয়া যায়। মাঝে মাঝে আলোর শ্রেণী, ঘণ্টাধ্বনি, কোলাহল, বিচিত্র আওয়াজে স্টেশনের নাম হাঁকা, আবার ঠং ঠং ঠং তিনটে ঘণ্টার শব্দে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অন্তর্হিত—সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল স্তিমিততারা নিশীথিনীর মধ্যে গাড়ির চাকার অবিশ্রাম শব্দ। সেই শব্দের তালে তালে মাথার ভিতরে সৃষ্টিছাড়া স্বপ্নের দল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। রাত চারটের সময় মধুপুর স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইল। অন্ধকার মিলাইয়া আসিলে পর প্রভাতের আলোকে গাড়ির জানলায় বসিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম।

গাড়ি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাঙা মাঠের এক-এক জায়গায় শুষ্ক নদীর বালুকা-রেখা দেখা যায় ; সেই নদীর পথে বড়ো বড়ো কালো কালো পাথর পৃথিবীর কঙ্কালের মতো বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে এক-একটা মুণ্ডের মতো পাহাড় দেখা যাইতেছে। দূরের পাহাড়গুলি ঘন নীল, যেন আকাশের নীল মেঘ খেলা করিতে আসিয়া পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে; আকাশে উড়িবার জন্য যেন পাখা তুলিয়াছে, কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না ; আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া

তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে। ঐ দেখো, পাথরের মতো কালো, ঝাঁকড়া চুলের ঝুঁটি-বাঁধা মানুষ হাতে একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া। দুটো মহিষের ঘাড়ে একটা লাঙল জোড়া, এখনও চাষ আরম্ভ হয় নাই, তাহারা স্থির হইয়া রেলগাড়ির দিকে তাকাইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক-একটা জায়গা ঘৃতকুমারীর বেড়া দিয়া ঘেরা, পরিষ্কার তক্‌তক্‌ করিতেছে, মাঝখানে একটি বাঁধানো ইঁদারা। চারি দিক বড়ো শুষ্ক দেখাইতেছে। পাৎলা লম্বা শুক্‌নো সাদা ঘাসগুলো কেমন যেন পাকা চুলের মতো দেখাইতেছে। বেঁটে বেঁটে পত্রহীন গুল্মগুলি শুকাইয়া বাঁকিয়া কালো হইয়া গেছে। দূরে দূরে এক-একটা তালগাছ ছোট্ট মাথা ও একখানি দীর্ঘ পা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক-একটা অশথগাছ আমগাছও দেখা যায়। শুষ্ক ক্ষেত্রের মধ্যে একটিমাত্র পুরাতন কুটিরের চালশূন্য ভাঙা ভিত্তি নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে একটা মস্ত গাছের দগ্ধ গুঁড়ির খানিকটা।

সকালে ছয়টার সময় গিরিডি স্টেশনে গিয়া পৌঁছিলাম। আর রেলগাড়ি নাই। এখান হইতে ডাকগাড়িতে যাইতে হইবে। ডাকগাড়ি মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। এ'কে কি আর গাড়ি বলে। চারটে চাকার উপর একটা ছোটো খাঁচা মাত্র।

সর্বপ্রথমে গিরিডি ডাকবাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল। ডাকবাংলার যত দূরে চাই ঘাসের চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে গোটাকতক গাছ আছে। চারিদিকে যেন রাঙামাটির ঢেউ উঠিয়াছে। একটা রোগা টাটু ঘোড়া গাছের তলায় বাঁধা ; চারি দিকে চাহিয়া

কী যে খাইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না, কোনো কাজ না থাকাতে গাছের গুঁড়িতে গা ঘসিয়া গা চুলকাইতেছে। আর-একটা গাছে একটা ছাগল লম্বা দড়িতে বাঁধা, সে বিস্তর গবেষণায় শাকের মতো একটু একটু সবুজ উদ্ভিদ্-পদার্থ পট্ পট্ করিয়া ছিঁড়িতেছে।

এখান হইতে যাত্রা করা গেল। পাহাড়ে রাস্তা; সম্মুখে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। শুষ্কশূন্য সুবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সাপের মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া ছায়াহীন সুদীর্ঘ পথ রৌদ্রে শুইয়া আছে। একবার কষ্টেসৃষ্টে টানিয়া ঠেলিয়া গাড়ি চড়াও রাস্তার উপর তুলিতেছে, একবার গাড়ি গড়্ গড়্ করিয়া দ্রুতবেগে ঢালু রাস্তায় নামিয়া যাইতেছে। ক্রমে চলিতে চলিতে আশেপাশে পাহাড় দেখা দিতে লাগিল। লম্বা লম্বা সরু সরু শালগাছ। উইয়ের ঢিবি। কাটা গাছের গুঁড়ি। স্থানে স্থানে এক-একটা পাহাড় আগাগোড়া কেবল দীর্ঘ সরু পত্রলেশশূন্য গাছে আচ্ছন্ন। উপবাসী গাছগুলো তাহাদের শুষ্ক শীর্ণ অস্থিময় দীর্ঘ আঙুল আকাশের দিকে তুলিয়া আছে; এই পাহাড়গুলাকে দেখিলে মনে হয়, যেন ইহারা সহস্র তীরে বিদ্ধ হইয়াছে, যেন ভীষ্মের শরশয্যা হইয়াছে। আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কুলিরা গাড়ি টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে পথের নুড়িতে হুঁচট খাইয়া গাড়িটা অত্যন্ত চমকিয়া উঠিতেছে। মাঝের এক

জায়গায় পথ অবসান হইয়া বিস্তৃত বালুকাশয্যায় একটি ক্ষীণ নদীর রেখা দেখা দিল। নদীর নাম জিজ্ঞাসা করাতে কুলিরা কহিল বড়াকর নদী। টানাটানি করিয়া গাড়ি এই নদীর উপর দিয়া পার করিয়া আবার রাস্তায় তুলিল। রাস্তার দুই পাশে ডোবাতে জল দাঁড়াইয়াছে; তাহাতে চার-পাঁচটা মহিষ পরস্পরের গায়ে মাথা রাখিয়া অর্ধেক শরীর ডুবাইয়া আছে, পরম আলস্যভরে আমাদের দিকে এক-একবার কটাক্ষপাত করিতেছে মাত্র।

যখন সন্ধ্যা আসিল, আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। অদূরে দুইটি পাহাড় দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া উঠিয়া নামিয়া পথ গিয়াছে। যেখানেই চাহি চারি দিকে লোক নাই, লোকালয় নাই, শস্য নাই, চষা মাঠ নাই; চারি দিকে উঁচু-নিচু পৃথিবী নিস্তব্ধ নিঃশব্দ কঠিন সমুদ্রের মতো ধূ ধূ করিতেছে। দিক্-দিগন্তরের উপরে গোধূলির চিক্‌চিকে সোনালি আঁধারের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও জনমানব জীবজন্তু নাই বটে, তবু মনে হয় এই সুবিস্তীর্ণ ভূমিশয্যায় যেন কোন্-এক বিরাট পুরুষের জন্য নিদ্রার আয়োজন হইতেছে। কে যেন প্রহরীর ন্যায় মুখে আঙুল দিয়া দাঁড়াইয়া, তাই সকলে ভয়ে নিশ্বাস রোধ করিয়া আছে। দূর হইতে উপছায়ার মতো একটি পথিক ঘোড়ার পিঠে বোঝা দিয়া আমাদের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রাত্রিটা কোনোমতে জাগিয়া, ঘুমাইয়া, পাশ ফিরিয়া কাটিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া দেখি, বামে ঘন পত্রময় বন। গাছে গাছে লতা, ভূমি নানাবিধ গুল্মে আচ্ছন্ন। বনের মাথার উপর দিয়া দূর

পাহাড়ের নীল শিখর দেখা যাইতেছে। মস্ত মস্ত পাথর। পাথরের ফাটলে এক-একটা গাছ; তাহাদের ক্ষুধিত শিকড়গুলো দীর্ঘ হইয়া চারি দিক হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পাথরখানাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহারা কঠিন মুঠি দিয়া খাদ্য আঁকড়িয়া ধরিতে চায়। সহসা বামে জঙ্গল কোথায় গেল। সুদূরবিস্তৃত মাঠ। দূরে গোরু চরিতেছে, তাহাদিগকে ছাগলের মতো ছোটো ছোটো দেখাইতেছে। মহিষ কিম্বা গোরুর কাঁধে লাঙল দিয়া পশুর লাঙ্গুল মলিয়া চাষীরা চাষ করিতেছে। চষা মাঠ বামে পাহাড়ের উপর সোপানে সোপানে থাকে থাকে উঠিয়াছে।

বেলা তিনটার সময় হাজারিবাগের ডাকবাংলায় আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে হাজারিবাগ শহরটি অতি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। শাহরিক ভাব বড়ো নাই। গলিঘুঁজি, আবর্জনা, নর্দামা, ঘেঁসাঘেঁসি, গোলমাল, গাড়িঘোড়া, ধুলোকাদা, মাছিমশা, এ-সকলের প্রাদুর্ভাব বড়ো নাই। মাঠ পাহাড় গাছপালার মধ্যে শহরটি তক্ তক্ করিতেছে।

এক দিন কাটিয়া গেল। এখন দুপুর বেলা। ডাকবাংলার বারান্দার সম্মুখে কেদারায় একলা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। আকাশ সুনীল। দুই খণ্ড শীর্ণ মেঘ সাদা পাল তুলিয়া চলিয়াছে। অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। একরকম মেঠো-মেঠো ঘেসো-ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। বারান্দার চালের উপর একটা কাঠবিড়ালি। দুই শালিক বারান্দায় আসিয়া চকিতভাবে পুচ্ছ নাচাইয়া লাফাইতেছে। পাশের রাস্তা দিয়া গোরু লইয়া যাইতেছে।

তাহাদের গলায় ঘণ্টার ঠুং ঠুং শব্দ শুনিতেছি। লোকজনেরা কেউ ছাতা মাথায় দিয়া, কেউ কাঁধে মোট লইয়া, কেউ দু-একটা গোরু তাড়াইয়া, কেউ একটা ছোটো টাট্টুর উপর চড়িয়া, রাস্তা দিয়া অতি ধীরে-সুস্থে চলিতেছে; কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, মুখে ভাবনার চিহ্ন নাই। দেখিলে মনে হয়, এখানকার মানবজীবন দ্রুত এঞ্জিনের মতো হাঁস্‌ফাঁস্‌ করিয়া, অথবা গুরুভারাক্রান্ত গোরুর গাড়ির চাকার মতো আর্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে না। গাছের তলা দিয়া দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর যেমন ছায়ায় ছায়ায় কুল্‌কুল্‌ করিয়া যায়, জীবন তেমনি করিয়া যাইতেছে। সমুখে ঐ আদালত। কিন্তু এখানকার আদালতও তেমন কঠোরমূর্তি নয়। ভিতরে যখন উকিলে উকিলে শামলার শামলায় লড়াই বাধিয়াছে তখন বাহিরের অশথগাছ হইতে দুই পাপিয়ার অবিশ্রাম উত্তর প্রত্যুত্তর চলিয়াছে। বিচারপ্রার্থী লোকেরা আমগাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা করিয়া হা হা করিয়া হাসিতেছে। এখান হইতে শুনিতে পাইতেছি। মাঝে মাঝে আদালত হইতে মধ্যাহ্নের ঘণ্টা বাজিতেছে। চারি দিকে যখন জীবনের মৃদুমন্দ গতি তখন এই ঘণ্টার শব্দ শুনিলে টের পাওয়া যায় যে, শৈথিল্যের স্রোতে সময় ভাসিয়া যায় নাই; সময় মাঝখানে দাঁড়াইয়া প্রতি ঘণ্টায় লৌহ-কণ্ঠে বলিতেছে, "আর কেহ জাগুক না-জাগুক, আমি জাগিয়া আছি।"—

কিন্তু লেখকের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। আমার চোখে তন্দ্রা আসিতেছে।

কবিতা

কাঙালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি,
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন।
চারি দিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড়ো ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনকতপন।
কত কে যে আসে কত যায়,
কেহ হাসে কেহ গান গায়,
কত বরনের বেশভূষা
ঝলকিছে কাঞ্চনরতন—
কত পরিজন দাসদাসী,
পুষ্পপাতা কত রাশি রাশি—
চোখের উপরে পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন।

হেরো তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।

শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে।
মার মায়া পায় নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে।
তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা।
চেয়ে যেন মা'র মুখ-পানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে, "মা গো, এ কেমন ধারা
এত বাঁশি, এত হাসিরাশি,
এত তোর রতনভূষণ—
তুই যদি আমার জননী
মোর কেন মলিন বসন!"

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলি
ভাই-বোন করি গলাগলি
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই

বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে,
"আমি তো ওদের কেহ নই
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়ে তো দেয় নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়ে তো দেয় নি নয়ন।"

আপনার ভাই নেই ব'লে
ওরে কি রে ডাকিবে না কেহ।
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ।
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।
ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি।
দুয়ারেতে সজল নয়ন,
এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি!

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব।
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব।
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা,
তবে মিছে মঙ্গলকলস।

ফাল্গুন

ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল,
ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুল।
চঞ্চল মৌমাছি গুঞ্জরি গায়,
বেণুবনে মর্মরে দক্ষিণবায়।
স্পন্দিত নদীজল ঝিলিমিলি করে,
জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি বালুকার চরে।
নৌকা ডাঙায় বাঁধা, কাণ্ডারী জাগে—
পূর্ণিমারাত্রের মত্ততা লাগে।
খেয়াঘাটে ওঠে গান অশ্বথতলে,
পান্থ বাজায়ে বাঁশি আনমনে চলে।
ধায় সে বংশীরব বহুদূর গাঁয়,
জনহীন প্রান্তর পার হয়ে যায়।
দূরে কোন্ শয্যায় একা কোন্ ছেলে
বংশীর ধ্বনি শুনে ভাবে চোখ মেলে—
যেন কোন্ যাত্রী সে, রাত্রি অগাধ,
জ্যোৎস্না-সমুদ্রের তরী যেন চাঁদ।
চলে যায় চাঁদে চ'ড়ে সারা রাত ধরি,
মেঘেদের ঘাটে ঘাটে ছুঁয়ে যায় তরী।
রাত কাটে, ভোর হয়, পাখি জাগে বনে—
চাঁদের তরণী ঠেকে ধরণীর কোণে।

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, "বুঝেছ, উপেন ? এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি, "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই ;
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়োজোর মরিবার মতো ঠাঁই।"
শুনি রাজা কহে, "বাপু, জান তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।" কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, "করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে— এমনি লক্ষ্মীছাড়া !"
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, "আচ্ছা সে দেখা যাবে।"

পরে মাস দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য—
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।

ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এইমতো কাটে বছর পনেরো-ষোলো,
এক দিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হল।

নমোনমো নম, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি!
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল— নিশীথশীতল স্নেহ।
বুক-ভরা-মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভ'রে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজ গ্রামে
কুমারের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে।
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে,
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি;
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে সেই আমগাছ, এ কী!
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা।

সেই মনে পড়ে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন—
ভাবিলাম, হায়, আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন।
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে ;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এত খনে আমারে চিনিল মাতা।
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।

হেনকালে হায় যমদূতপ্রায় কোথা হতে এল মালী ;
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, "আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব ;
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব!"
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধ'রে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ ;
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতেছিলেন মাছ ;
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, "মারিয়া করিব খুন।"
বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভিগ মাগি মহাশয়।"
বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি—এই ছিল মোর ঘটে!
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

পূজারিনী

অবদানশতক

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদনখকণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদকাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ
শিল্পশোভার সার।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনকপ্রদীপমালা।

অজাতশত্রু রাজা হল যবে
পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে,
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।

কহিলা ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ হবে।"

সেদিন শারদ-দিবা-অবসান—
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বাহিয়া
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়ালো আসি।

শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা—
"এ কথা নাহি কি মনে
অজাতশত্রু করেছে রটনা—
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ-রচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্বাসনে।"

সেথা হতে ফিরি গেল চলি ধীরে
বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
সীমন্তসীমা-'পরে।

শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত—
কহিল, "অবোধ, কী সাহস-বলে
এনেছিস পূজা! এখনি যা চ'লে।
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে
বিষম বিপদপাত।"

অস্তরবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী,
চমকি উঠিল শুনি কিঙ্কিণী,
চাহিয়া দেখিল দ্বারে।

শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে—
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে
এমন ক'রে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে!"

দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্য-থালি।
"হে পুরবাসিনী," সবে ডাকি কয়—
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময়।"
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি।

দিবসের শেষ আলোক মিলালো
নগরসৌধ-'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ,
আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজদেবালয়-ঘরে।

শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
তারা অগণ্য জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হল সমাধান"
দ্বারী ফুকারিয়া বলে।

এমন সময়ে হেরিলা চমকি
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন-মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মতো।

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি
শুধালো, "কে তুই, ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি !"
মধুর কণ্ঠে শুনিল "শ্রীমতী
আমি বুদ্ধের দাসী"।

সেদিন শুভ্র পাষাণফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

দিদি

নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমী মজুর। তাহাদেরি ছোটো মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা ; কত ঘষা মাজা
ঘটি বাটি থালা লয়ে ; আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেক বার ; পিত্তলকঙ্কণ
পিতলের থালি-'পরে বাজে ঠন্ ঠন্—
বড়ো ব্যস্ত সারা দিন। তারি ছোটো ভাই—
নেড়া মাথা, কাদা মাখা, গায়ে বস্ত্র নাই,
পোষা প্রাণীটির মতো পিছে পিছে এসে
বসি থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে
স্থির ধৈর্যভরে। ভরা ঘট লয়ে মাথে,
বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশুকর ; জননীর প্রতিনিধি,
কর্মভারে অবনত অতি-ছোটো দিদি।

স্পর্শমণি

ভক্তমাল

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম।
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।
শুধালেন সনাতন, "কোথা হতে আগমন,
কী নাম ঠাকুর।"
বিপ্র কহে, "কিবা কব, পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি বহু দূর।
জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম
জিলা বর্ধমানে—
এতবড়ো ভাগ্যহত দীনহীন মোর মতো
নাই কোনোখানে।
জমি-জমা আছে কিছু, করে আছি মাথা নিচু,
অল্পস্বল্প পাই।
ক্রিয়াকর্ম-যজ্ঞযাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে,
আজ কিছু নাই।
আপন উন্নতি-লাগি শিব-কাছে বর মাগি
করি আরাধনা—

একদিন নিশিভোরে স্বপ্নে দেব কন মোরে—
'পুরিবে প্রার্থনা ;
যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধরো দুটি পায়,
তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায়।' "

শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন—
"কী আছে আমার।
যাহা ছিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি,
ভিক্ষামাত্র সার।"
সহসা বিস্মৃতি ছুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে—
"ঠিক বটে, ঠিক।
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশমানিক।
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে ;
নিয়ে যাও হে ঠাকুর, দুঃখ তব হবে দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।"
বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি—

লোহার মাছুলি ছুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি,
ছুঁইল যেমনি।

ব্রাহ্মণ বালুর 'পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে,
ভাবে নিজে নিজে—
যমুনা কল্লোল-গানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কী যে।
নদীপারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে,
তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রুজলে—
"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে।" —এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মানিক।

বিবাহ

রাজস্থান

প্রহরখানেক রাত হয়েছে শুধু,
        ঘন ঘন বেজে উঠে শাঁখ!
বর-কন্যা যেন ছবির মতো
আঁচল-বাঁধা দাঁড়িয়ে আঁখি-নত,
জানলা খুলে পুরাঙ্গনা যত
        দেখছে চেয়ে ঘোমটা করি ফাঁক।
বর্ষারাতে মেঘের গুরু গুরু,
        তারি সঙ্গে বাজে বিয়ের শাঁখ।

ঈশান কোণে থম্‌কে আছে হাওয়া,
        মেঘে মেঘে আকাশ আছে ঘেরি
সভাকক্ষে হাজার দীপালোকে
মণিমালায় ঝিলিক হানে চোখে;
সভার মাঝে হঠাৎ এল ও কে—
        বাহির-দ্বারে বেজে উঠল ভেরী।
চম্‌কে ওঠে সভার যত লোকে,
        উঠে দাঁড়ায় বর-ক'নেরে ঘেরি।

টোপর-পরা মৈত্রিরাজকুমারে
কহে তখন মাড়োয়ারের দূত—
"যুদ্ধ বাধে বিদ্রোহীদের সনে,
রামসিংহ রানা চলেন রণে,
তোমরা এসো তাঁরি নিমন্ত্রণে
যে যে আছ মর্তিয়া রাজপুত !"
"জয় রানা রাম সিঙের জয়"
গর্জি উঠে মাড়োয়ারের দূত।

"জয় রানা রাম সিঙের জয়"
মৈত্রিপতি ঊর্ধ্বস্বরে কয়।
ক'নের বক্ষ কেঁপে ওঠে ডরে,
দুটি চক্ষু ছলছল করে,
বরযাত্রী হাঁকে সমস্বরে—
"জয় রানা রাম সিঙের জয় !"
"সময় নাহি মৈত্রিরাজকুমার"
মহারানার দূত উচ্চে কয়।

বৃথা কেন উঠে হুলুধ্বনি,
বৃথা কেন বেজে উঠে শাঁখ !
বাঁধা আঁচল খুলে ফেলে বর,
মুখের পানে চাহে পরস্পর,

কহে, "প্রিয়ে, নিলেম অবসর—
এসেছে ঐ মৃত্যুসভার ডাক।"
বৃথা এখন ওঠে হুলুধ্বনি,
বৃথা এখন বেজে ওঠে শাঁখ।

বরের বেশে টোপর পরি শিরে
ঘোড়ায় চড়ি ছুটে রাজকুমার।
মলিনমুখে নম্র নত শিরে
কন্যা গেল অন্তঃপুরে ফিরে ;
হাজার বাতি নিবল ধীরে ধীরে,
রাজার সভা হল অন্ধকার।
গলায় মালা, টোপর পরা শিরে,
ঘোড়ায় চড়ি ছুটে রাজকুমার।

মাতা কেঁদে কহেন, "বধূবেশ
খুলিয়া ফেল্ হায় রে হতভাগী।"
শান্তমুখে কন্যা কহে মায়ে—
"কেঁদো না মা, ধরি তোমার পায়ে,
বধূসজ্জা থাক্ মা, আমার গায়ে—
মেত্রিপুরে যাইব তাঁর লাগি।"
শুনে মাতা কপালে কর হানি
কেঁদে কহেন, "হায় রে হতভাগী

গ্রহবিপ্র আশীর্বাদ করি
ধান-দূর্বা দিল তাহার মাথে।
চড়ে কন্যা চতুর্দোলা-'পরে,
পুরনারী হুলুধ্বনি করে,
রঙিন বেশে কিংকরী-কিংকরে
সারি সারি চলে বালার সাথে।
মাতা আসি চুমো খেলেন মুখে,
পিতা আসি হস্ত দিলেন মাথে।

নিশীথ-রাতে আকাশ আলো করি
কে এল রে মৈত্রিপুরদ্বারে!
"থামাও বাঁশি" কহে, "থামাও বাঁশি—
চতুর্দোলা নামাও রে দাসদাসী।
মিলেছি আজ মৈত্রিপুরবাসী
মৈত্রিপতির চিতা রচিবারে।
মৈত্রিরাজা যুদ্ধে হত আজি,
দুঃসময়ে কারা এলে দ্বারে।"

"বাজাও বাঁশি, ওরে বাজাও বাঁশি"
চতুর্দোলা হতে বধূ বলে—
"এবার লগ্ন আর হবে না পার,
আঁচলে গাঁঠ খুলবে না তো আর,

শেষের মন্ত্র উচ্চারো এইবার
শ্মশান-সভায় দীপ্ত চিতানলে।
বাজাও বাঁশি, ওরে বাজাও বাঁশি।”—
চতুর্দোলা হতে বধূ বলে।

বরের বেশে, মোতির মালা গলে,
মৈত্রিপতি চিতার ’পরে শুয়ে।
দোলা হতে নামল আসি নারী,
আঁচল বাঁধি রক্তবাসে তাঁরি
শিয়র-’পরে বৈসে রাজকুমারী
বরের মাথা কোলের ’পরে থুয়ে।
নিশীথ-রাতে মিলন-সজ্জা-পরা
মৈত্রিপতি চিতার ’পরে শুয়ে।

ঘন ঘন জাগল হুলুধ্বনি,
দলে দলে আসে পুরাঙ্গনা।
কয় পুরোহিত “ধন্য সুচরিতা”,
গাহিছে ভাট “ধন্য মৃত্যুজিতা”,
ধূ ধূ ক’রে জ্বলে উঠল চিতা—
কন্যা বসে আছেন যোগাসনা।
জয়ধ্বনি উঠে শ্মশান-মাঝে,
হুলুধ্বনি করে পুরাঙ্গনা।

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরোঝরো,
আউশের ক্ষেত জলে ভরো-ভরো,
কালী-মাখা মেঘে ও পারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ্‌ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে।

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘন ঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্‌ দেখি,
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরেছে কি
রাখাল-বালক কী জানি কোথায়
সারা দিন আজ খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু
পোহালে।

শোনো শোনো ওই পারে যাবে ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল
ছলছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।

ওগো, আজ তোরা যাস নে গো তোরা
যাস নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর
নাহি রে।
ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘন ঘন
পথপাশে দেখ্ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে।

নগরলক্ষ্মী

কল্পদ্রুমাবদান

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তিপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে—
"ক্ষুধিতেরে অন্নদান-সেবা
তোমরা লইবে বলো কে বা।"

শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
কহিল সে কর জুড়ি— "ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী,
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি
এমন ক্ষমতা নাহি স্বামী।"

কহিল সামন্ত জয়সেন—
"যে আদেশ প্রভু করিছেন
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোনো কাজ—
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ।"

নিশ্বাসিয়া কহে ধর্মপাল—
"কী কব, এমন দগ্ধ ভাল,
আমার সোনার ক্ষেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত,
রাজকর যোগানো কঠিন—
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।"

রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।
নির্বাক্ সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখিদুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদসুতা, বেদনায় অশ্রুপ্লুতা,
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে—

"ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।
কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা-
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।"

বিস্ময় মানিল সবে শুনি—
"ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী,
কোন্ অহংকারে মাতি লইলে মস্তক পাতি
এ-হেন কঠিন গুরু কাজ।
কী আছে তোমার, কহো আজ।"

কহিল সে নমি সবা-কাছে—
"শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।
আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া,
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।"

বিম্ববতী

রূপকথা

সযত্নে সাজিল রানী, বাঁধিল কবরী,
নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরি
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে
মায়াময় কনকদর্পণ। মন্ত্র পড়ি
শুধাইল তারে, "কহো মোরে সত্য করি,
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।"
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী, সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে।

তার পরদিন রানী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি দিল কেশভার
আজানুচুম্বিত। গোলাপী অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাস-সম, বক্ষে দিল টানি।

সুবর্ণমুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি, “কহো সত্য ক’রে,
ধরা-মাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।”
দর্পণে উঠিল ফুটি সেই মুখশশী।
কাঁপিয়া কহিল রানী, অগ্নিসম জ্বালা,
“পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জ্ব’লে সতিনের মেয়ে!
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!”

তার পরদিনে আবার রুধিল দ্বার
শয়নমন্দিরে। পরিল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দূরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে, “কহো সত্য করি
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী।”
উজ্জ্বল কনকপটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাখা মুখ। হিংসায় লুটিল
রানী শয্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া—
“বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতিনের মেয়ে!
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!”

তার পরদিনে আবার সাজিল সুখে
নব অলংকারে, বিরচিল হাসিমুখে
কবরী নূতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা।
পরিল যতন করি নবরৌদ্রবিভা
নব পীতবাস। দর্পণ সম্মুখে ধ'রে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি, "সত্য কহো মোরে,
ধরা-মাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।"
সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি
মোহনমুকুরে। রানী কহিল জ্বলিয়া—
"বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতিনের মেয়ে!
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!"

তার পরদিনে রানী কনকরতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।
দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে,
"সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বলো সত্য ক'রে।"
দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি—
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে। অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রানীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মতো।

চাৎকারি কহিল রানী কর হানি বুকে—
“মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে,
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতিনের মেয়ে!
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!”

ঘষিতে লাগিল রানী কনকমুকুর
বালু দিয়ে, প্রতিবিম্ব নাহি হল দূর।
মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না,
অগ্নি দিল তবুও তো গলিল না সোনা।
আছাড়ি ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে—
ভাঙিল না সে মায়াদর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রানী, টুটি গেল প্রাণ;
সর্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে; ভূমে পড়ি তারি পাশে
কনকদর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

কর্ম

ভৃত্যের না পাই দেখা প্রাতে।

দুয়ার রয়েছে খোলা, স্নানজল নাই তোলা—

মূর্খাধম আসে নাই রাতে।

মোর ধৌত বস্ত্রখানি কোথা আছে নাহি জানি,

কোথা আহারের আয়োজন।

বাজিয়া যেতেছে ঘড়ি, বসে আছি রাগ করি,

দেখা পেলে করিব শাসন।

বেলা হলে অবশেষে প্রণাম করিল এসে,

দাঁড়াইল করি করজোড়।

আমি তারে রোষভরে কহিলাম, "দূর হ রে,

দেখিতে চাহি নে মুখ তোর।"

শুনিয়া মূঢ়ের মতো ক্ষণকাল বাক্যহত

মুখে মোর রহিল সে চেয়ে—

কহিল গদ্‌গদস্বরে, "কালি রাত্রি দ্বিপ্রহরে

মারা গেছে মোর ছোটো মেয়ে।"

এত কহি ত্বরা করি গামোছাটি কাঁধে ধরি

নিত্য কাজে গেল সে একাকী।

প্রতি দিবসের মতো ঘষামাজা মোছা কত

কোনো কর্ম রহিল না বাকি।

সামান্য ক্ষতি

দিব্যাবদানমালা

বহে মাঘমাসে শীতের বাতাস,
　　স্বচ্ছসলিলা বরুণা।
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে
স্নানে চলেছেন শত সখী-সনে
　　কাশীর মহিষী করুণা।

সে পথ সে ঘাট আজি এ প্রভাতে
　　জনহীন রাজশাসনে।
নিকটে যে-ক'টি আছিল কুটির
ছেড়ে গেছে লোক, তাই নদীতীর
স্তব্ধ গভীর, কেবল পাখির
　　কূজন উঠিছে কাননে।

আজি উতরোল উত্তর-বায়ে
　　উতলা হয়েছে তটিনী।
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে,
পুলকে উছলি ঢেউ ছলছলে,
লক্ষ মানিক ঝলকি আঁচলে
　　নেচে চলে যেন নটিনী।

কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলি ;
মৃণালভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে,
আলাপে প্রলাপে হাসি-উচ্ছ্বাসে
আকাশ উঠিল আকুলি।

স্নান সমাপন করিয়া যখন
কূলে উঠে নারী-সকলে
মহিষী কহিলা, "উহু, শীতে মরি,
সকল শরীর উঠিছে শিহরি—
জ্বেলে দে আগুন, ওলো সহচরী,
শীত নিবারিব অনলে।"

সখীগণ সবে কুড়াইতে কুটা
চলিল কুসুমকাননে।
কৌতুকরসে পাগলপরানী
শাখা ধরি সবে করে টানাটানি,
সহসা সবারে ডাক দিয়া রানী
কহে সহাস্য-আননে—

"ওলো, তোরা আয়! ওই দেখা যায়
কুটির কাহার অদূরে।
ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল,
তপ্ত করিব করপদতল।"
এত বলি রানী রঙ্গে বিভল
হাসিয়া-উঠিল মধুরে।

কহিল মালতী সকরুণ অতি—
"এ কী পরিহাস রানী মা,
আগুন জ্বালায়ে কেন দিবে নাশি—
এ কুটির কোন্ সাধু সন্ন্যাসী
কোন্ দীনজন কোন্ পরবাসী
বাঁধিয়াছে নাহি জানি মা।"

রানী কহে রোষে, "দূর করি দাও
এই দীনদয়াময়ীরে।"
অতি দুর্দাম কৌতুকরত
যৌবনমদে নিষ্ঠুর যত
যুবতীরা মিলি পাগলের মতো
আগুন লাগালো কুটিরে।

ঘন ঘোর ধূম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িল।
দেখিতে দেখিতে হুহু হুংকারি
ঝলকে ঝলকে উল্কা উগারি
শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি
বহ্নি আকাশ জুড়িল।

পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিল যেন রে
জ্বালাময়ী যত নাগিনী—
ফণা নাচাইয়া অম্বর-পানে
মাতিয়া উঠিল গর্জনগানে ;
প্রলয়মত্ত রমণীর কানে
বাজিল দীপক রাগিণী।

প্রভাত-পাখির আনন্দগান
ভয়ের বিলাপে টুটিল—
দলে দলে কাক করে কোলাহল,
উত্তরবায়ু হইল প্রবল,
কুটির হইতে কুটিরে অনল
উড়িয়া উড়িয়া ছুটিল।

ছোটো গ্রামখানি লেহিয়া লইল
প্রলয়লোলুপ রসনা।
জনহীন পথে মাঘের প্রভাতে
প্রমোদক্লান্ত শত সখী-সাথে
ফিরে গেল রানী, কুবলয় হাতে,
দীপ্ত অরুণ-বসনা।

তখন সভায় বিচার-আসনে
বসিয়াছিলেন ভূপতি।
গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে,
দ্বিধাকম্পিত গদ্গদ ভাষে
নিবেদিল দুখ সংকোচে ত্রাসে
চরণে করিয়া বিনতি।

সভাসন ছাড়ি উঠি গেল রাজা,
রক্তিমমুখ শরমে।
অকালে পশিলা রানীর আগার—
কহিলা, "মহিষী, এ কী ব্যবহার!
গৃহ জ্বালাইলে অভাগা প্রজার
বলো কোন্ রাজ-ধরমে।"

রুষিয়া কহিলা রাজার মহিলা—
"গৃহ কহ তারে কী বোধে!
গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটির,
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর।
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে!"

কহিলেন রাজা উদ্যত রোষ
রুধিয়া দীপ্ত হৃদয়ে—
"যত দিন তুমি আছ রাজরানী
দীনের কুটিরে দীনের কী হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি—
বুঝাব তোমারে নিদয়ে।"

রাজার আদেশে কিংকরী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া;
অরুণবরণ অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি,
ভিখারি নারীর চীরবাস আনি
দিল রানী-দেহে তুলিয়া।

পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা–
“মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে ;
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে-ক’টি কুটির হল ছারখার
যত দিনে পার সে-ক’টি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।

বৎসরকাল দিলেম সময়,
তার পর ফিরে আসিয়া
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতী,
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটির নাশিয়া।”

বঙ্গলক্ষ্মী

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনে-ঘেরা সহস্র কুটিরে,
দোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণ-ঘাটে, দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্য কল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন সহস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।

এ বিশ্বসমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোনো কাজে,
নাহি জান সে বারতা! তুমি শুধু মা গো,
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগ!
নিত্যকর্মে রত শুধু, অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যূষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি
রৌদ্র নিবারিছ— যবে আসে বিভাবরী
চারি দিক হতে তব যত নদ-নদী
ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহু-পাশে।
শরৎ-মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে

ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোতকূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাতা—প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা ; স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়
ধৈর্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দিক্‌ময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্বাদ করে বিকিরণ।
হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,
মধুর মঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল,
নতশির কবি-চক্ষে ভরি আসে জল।

মূল্যপ্রাপ্তি

অঘ্রানে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া ;
সুদাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কী করিয়া।
তুলি লয়ে বেচিবারে গেল সে প্রাসাদদ্বারে,
মাগিল রাজার দরশন,
হেনকালে হেরি ফুল আনন্দে পুলকাকুল
পথিক কহিল একজন—
"অকালের পদ্ম তব আমি এটি কিনি লব,
কত মূল্য লইবে ইহার।
বুদ্ধ ভগবান আজ এসেছেন পুরমাঝ,
তাঁর পায়ে দিব উপহার।"
মালী কহে, "এক মাষা স্বর্ণ পাব মনে আশা।"
পথিক চাহিল তাহা দিতে—
হেনকালে সমারোহে বহু পূজা-অর্ঘ্য ব'হে
নৃপতি বাহিরে আচম্বিতে।

রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ উচ্চারি মঙ্গলগীত
চলেছেন বুদ্ধ-দরশনে ;
হেরি অকালের ফুল শুধালেন, “কত মূল ?
কিনি দিব প্রভুর চরণে।”
মালী কহে, “হে রাজন্, স্বর্ণমাষা দিয়ে পণ
কিনিছেন এই মহাশয়।”
“দশ মাষা দিব আমি” কহিলা ধরণীস্বামী,
“বিশ মাষা দিব” পান্থ কয়।
দোঁহে কহে “দেহো দেহো”, হার নাহি মানে কেহ,
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।
মালী ভাবে, যাঁর তরে এ দোঁহে বিবাদ করে
তাঁরে দিলে আরো পাব কত !
কহিল সে করজোড়ে, “দয়া ক'রে ক্ষম' মোরে,
এ ফুল বেচিতে নাহি মন।”
এত বলি ছুটিল সে যেথা রয়েছেন ব'সে
বুদ্ধদেব উজলি কানন।

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর-'পরে
করুণার সুধাহাস্য-জ্যোতি।

সুদাস রহিল চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
মুখে তার বাক্য নাহি সরে।
সহসা ভূতলে পড়ি পদ্মটি রাখিল ধরি
প্রভুর চরণপদ্ম-'পরে।
বরষি অমৃতরাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি,
"কহো বৎস, কী তব প্রার্থনা।"
ব্যাকুল সুদাস কহে, "প্রভু, আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এক কণা।"

মধ্যাহ্ন

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী-'পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাট-তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি। শ্যামশষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছপক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের 'পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।
শুষ্কতৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ— চলে যায় বহু দূর।
থেকে থেকে ডেকে উঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্মর

জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য-'পরে
চিলের সুতীব্র ধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্তশব্দ বাঁধা তরণীর—মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে ব'সে আছি আমি পরবাসী

আদর্শ প্রশ্ন

প্রবন্ধ ও গল্প

রোগশত্রু

প্রাণ আছে যারই, আয়ু ফুরোলেই সে মারা যায়। সেই মৃত বস্তু খেয়ে ফেলে সরিয়ে দেয় দুই দল জীবাণু। তাদের খবর কী জান বলো।

জলে স্থলে বাস করে ছোটো-বড়ো জীবজন্তু, সেইসঙ্গে থাকে অসংখ্য জীবাণু। তা ছাড়া তারা থাকে বাতাসে। বিখ্যাত রসায়নবিৎ পাস্তুর তাদের সম্বন্ধে কী তথ্য সন্ধান করে বের করেছিলেন বিবৃত করো।

শ্বেতকণা ও লোহিতকণা এই দুই কণার যোগে আমাদের রক্তপ্রবাহ। শরীরে তারা কোন্ ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে।

বায়ুবিহারী রোগের আকর জীবাণুগুলি শরীরে প্রবেশ ক'রে রক্ত-বিহারী জীবাণুদের সঙ্গে কিরকম দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দেয় তার বর্ণনা করো।

আমেরিকার একটি বিদ্যালয়

য়ুনাইটেড স্টেট্‌স্'এ পোসম-ট্রট নামে এক গ্রাম আছে। তার বাসিন্দারা ছিল অশিক্ষিত, এবং শিক্ষার জন্য তাদের উৎসাহ ছিল না। মিস মার্থা বেরি নগর থেকে সেখানে বাস করতে এসেছিলেন ; পর্বতের শোভা ভোগ করে সেখানে আরাম করবেন এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু নিজের আরাম ভুলে পাহাড়িয়া ছেলেদের শিক্ষাদানব্রতে কেমন করে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তার ইতিহাস বর্ণনা করো।

প্রথমে কী কাজ আরম্ভ করলেন। গ্রাম্য ছেলেদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি কী বিচার করেছিলেন, তাঁর কাজ কিরকম করে চলল। য়ুনাইটেড স্টেট্‌স্‌'এর দাক্ষিণাত্যে কাফ্রিরাই হাতের কাজ করে ব'লে শ্বেতকায়রা সে-সব কাজ ঘৃণার বিষয় বলে মনে করে। মিস মার্থা সেই আপত্তির বিরুদ্ধে কী রকমে কৃতকার্য হয়েছিলেন। যাঁরা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ভার নিয়েছিলেন তাঁরা কিরকম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। এই দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গে লেখক আমাদের দেশের লোকের ঔদাসীন্য ও সংকল্পের দুর্বলতা সম্বন্ধে কী বলেছেন জানাও।

কাবুলিওয়ালা

বাঙালি মেয়ের সহিত কাবুলিওয়ালার স্নেহসম্বন্ধের ভিত্তিটি কোন্‌-খানে।

কাবুলিওয়ালার সঙ্গে কখন কী রকমে মিনির পরিচয় আরম্ভ হল।

মাঝখানে বাধা ঘটল কিসের। মিনির বিবাহ-দিনে জেল-ফেরত রহমতের উপস্থিতিতে মিনির বাপের অপ্রসন্নতা কেমন ক'রে মিলিয়ে গেল, কী মনে হল তাঁর। গল্পের শেষ ভাগে কী বেদনা জেগে উঠল কাবুলির মনে।

সমস্ত গল্পের মর্মকথাটা কী।

বাগান

বাড়ির চারি দিকে একখানি বাগান তৈরি করে তোলা যে বিলাসিতার আড়ম্বর নয়, চরিত্রগঠনের পক্ষে তার যে একটা প্রয়োজন আছে, তার প্রতি অবহেলায় নিজেকে এবং অন্য-সকলকে অসম্মান করা হয়, সে কথা বুঝিয়ে বলো।

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন

এই লেখায় বিদ্যাসাগরের চরিত্রের যে যে বিশেষত্বের কথা পড়েছ তার উল্লেখ করে লেখো।

সাক্ষী

সহজ করে সরল ভাষায় এই গল্পটি লেখো। এই কথাটি মনে রেখো যে, ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে কেবল যে রামকানাইয়ের শাস্তি হল তা নয়, তাঁর নিজের সাধুতার খ্যাতি হল না। বুদ্ধিমানেরা তাঁকে নির্বোধ ও চতুর লোকেরা তাঁকে দুর্বল ভীরু বলে অবজ্ঞা করল, এতেই তাঁর চরিত্রগৌরব আপনার ভিতর থেকে যথার্থ মূল্য পেয়েছে।

ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম

বাগান প্রবন্ধে যে তত্ত্বটি আছে এই প্রবন্ধে তারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। গরিব চাষী— কঠিন পরিশ্রমে তাকে দিন কাটাতে হয়, তবু সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এসে বাসস্থানকে সুন্দর করে তোলবার জন্যে এই-যে উৎসাহ তাকে দেওয়া হয়, ভেবে দেখতে গেলে এটা সমস্ত দেশের প্রতি কর্তব্যসাধন। দেশকে শ্রীসম্পন্ন করে তোলবার দায়িত্ব ব্যক্তিগত-ভাবে প্রত্যেক লোকের স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এই অধ্যবসায়ের অভাবে আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের কিরকম দুরবস্থা তোমার অভিজ্ঞতা থেকে তার বর্ণনা করো।

জাহাজের খোল

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশের যে হিতসাধনায় নিজের সর্বস্ব ক্ষয় করেছিলেন এই লেখায় তারই কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আছে। এই

জাহাজ-চালানো অবলম্বন করে অনেকে এমন ব্যবসায় করে থাকেন যাতে তাঁদের অর্থলাভ হতে পারে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের ব্যবসায় যে সিদ্ধিলাভের অভিমুখে ছিল তা অর্থলাভের বিপরীত দিকে। তাঁর সেই দেউলে-হওয়া অধ্যবসায়ের বিবরণ আপন ভাষায় লেখো। :যে উৎসাহের উৎস তাঁর মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে ছিল বলে এতবড় ক্ষতির মধ্যে তাঁকে অবসাদগ্রস্ত করতে পারে নি সেইটিই এই প্রবন্ধের মূল কথা।

উদ্যোগশিক্ষা

দেহে ও মনে, জ্ঞানে ও কর্মে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হবে, তাকে শিক্ষাদান করার উদ্দেশ্য এই। পুঁথিগত বিদ্যায় আমরা এমন অভ্যস্ত যে, এই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাকে আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করি। চারি দিকের প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য চলে গেছে। নানা প্রয়োজনের দাবি আমাদের চারি দিকে, অথচ মনের জড়ত্ববশতঃ সে দাবি আপন বুদ্ধিতে মেটাবার প্রতি উৎসাহ নেই, বহুকেলে বাঁধা প্রণালীর উপর ভর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি। এসম্বন্ধে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে লেখক যে-সব ব্যর্থতার লক্ষণ দেখেছেন তারই উল্লেখ করে প্রসঙ্গটির আলোচনা করো।

দেবীর বলি

এই গল্পাংশের মধ্যে যে কয়টি বর্ণনা আছে তাদের কিরকম করে ফলিয়ে তোলা হয়েছে তা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করো— প্রথম, জনশূন্য রাত্রি; দ্বিতীয়, জয়সিংহের চরম আত্মনিবেদনের সংকল্প; তৃতীয়, মন্দিরে রঘুপতির অপেক্ষা; চতুর্থ, জয়সিংহের আত্মহনন।

আহারের অভ্যাস

বাংলাদেশের আহার অত্যন্ত অপথ্য, এ কথা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ হয়ে গেছে। অথচ ভোজনে আমাদের রুচি এতই অত্যন্ত সংস্কারগত যে স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ রেখে তার পরিবর্তন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। বিষয়টার গুরুত্ব ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগা নিয়ে নয়, এই কথা মনে রেখে সমস্ত বাংলাদেশের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে আহার সম্বন্ধে আমাদের রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন করাই চাই—এ সম্বন্ধে আলোচনা করো।

দান-প্রতিদান

এই গল্পে রাধামুকুন্দের যে ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে তাকে নিন্দা করা যায় কি না, এবং যদি করা যায় তবে তা কেন নিন্দনীয় বুঝিয়ে বলো।

ছোটনাগপুর

এ লেখাকে ঠিকমতো ভ্রমণবৃত্তান্ত বলা চলে না, কেননা এতে নূতন-পরিচিত স্থান সম্বন্ধে কোনো খবর দেওয়া হয় নি, কেবল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পর পর ছবি দেওয়া হয়েছে। এই ছবিতে দেখা যায় বাংলাদেশের দৃশ্যের সঙ্গে এর তফাত। বাংলাদেশে তোমাদের পরিচিত কোনো পল্লীর ভিতর দিয়ে গোরুর গাড়িতে করে যাত্রা এমনভাবে বর্ণনা করো যাতে এই লেখার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

কবিতা

কাঙালিনী

ধনীর ঘরে পুজোর আয়োজন ও সমারোহ, আর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কাঙালিনী— বিস্তারিত ক'রে এই দৃশ্যের বর্ণনা করো। পুজো-বাড়িতে তোমরা যে দৃশ্য দেখেছ সেইটি মনে রেখো।

ফাল্গুন

জ্যোৎস্নারাত্রে ছেলেটি একলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কী কল্পনা করেছে, আর তার চারি দিকের দৃশ্যটি কিরকম, তোমাদের ভাষায় বলো। এই কবিতার ছন্দের বিশেষত্ব কী।

দুই বিঘা জমি

এই কবিতার ভাবখানি কী বুঝিয়ে বলো। এই আখ্যানের প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে এমন করে রস দেওয়া হয়েছে কেন।

পূজারিনী

অজাতশত্রু প্রাণদণ্ডের ভয় দেখিয়ে বুদ্ধের পূজা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই প্রাণদণ্ডই পূজার ব্যাঘাত না হয়ে পূজাকে কোন্ চরম মূল্যদ্বারা মূল্যবান করে তুলেছিল সেই কথাটি প্রকাশ করে লেখো।

দিদি

এ একটি ছবি। বালিকাবয়সী দিদি। তার মনে মাতৃস্নেহ রয়েছে বিকশিত, সে বাহিরে কাজকর্ম করতে যাওয়া-আসা করে, সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় শিশু ভাইটিকে। ছেলেটা খেলা করে আপনমনে, দিদি কাছা-কাছি কোথাও আছে এইটি জানলেই সে নিশ্চিন্ত। এই অত্যন্ত সরল কবিতাটি যদি তোমাদের ভালো লাগে তবে কেন লাগে লেখো।

স্পর্শমণি

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ যখন দেখলে সনাতন স্পর্শমণিকে নিস্পৃহমনে উপেক্ষা করলেন, তখন বুঝতে পারলে যে, লোভেই এই পাথরটাকে মিথ্যে দাম দিয়ে মনকে আসক্ত করে রেখেছে। লোভকে সরিয়ে নিলেই এটা হয় ঢেলা মাত্র। লোভ কখন চলে যায়?

বিবাহ

রাজপুতানার ইতিহাস থেকে এই গল্পটা নেওয়া। বিবাহসভায় মেত্রির রাজকুমারকে যুদ্ধে আহ্বান, বিবাহ অসমাপ্ত রেখে বরের যাত্রা রণক্ষেত্রে। তার অনতিকাল-পরে বিবাহের সাজে চতুর্দোলায় চড়ে বধূর গমন মেত্রিরাজপুরে, সেখানে যুদ্ধে নিহত কুমার তখন চিতাশয্যায়। সেইখানেই মৃত্যুর মিলনে বরকন্যার অসম্পূর্ণ বিবাহের পরিসমাপ্তি। কল্পনায় সমস্ত ব্যাপারটিকে আগাগোড়া উজ্জ্বল করে মনের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়াই এই কবিতার সার্থকতা।

বিবাহসভায় বরের প্রতি যুদ্ধের আহ্বান এবং বিবাহের প্রতিহত প্রত্যাশায় কন্যার মৃত্যুকে বরণ, এই দুই আকস্মিকতার নিদারুণতায় এই

কবিতার রস। এক দিকে করুণতা অন্য দিকে বীর্য মহিমালাভ করেছে, তারই ব্যাখ্যা করো।

আষাঢ়

আষাঢ়ে বর্ষা নেমেছে। পল্লীজীবনের একটি উদ্‌বেগের চাঞ্চল্যের উপর এই ছবিটি ঘনিয়ে উঠেছে। সেই উদ্‌বেগের কিরকম বর্ণনা করা হয়েছে মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে তোমাদের ভাষায় প্রকাশ করো।

নগরলক্ষ্মী

শ্রাবস্তীপুরীতে দুর্ভিক্ষ যখন দেখা দিল বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, এ নগরীর ক্ষুধা-নিবারণের ভার কে নেবে। তাদের প্রত্যেকের উত্তর শুনে বোঝা গেল, স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত ভাবে কারও সাধ্য নেই এই গুরুতর কর্তব্য সম্পন্ন করা। তখন অনাথপিণ্ডদের কন্যা ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া বললেন, "এই ভার আমি নেব।" ভিক্ষুণী আপন নিঃস্বতা সত্ত্বেও এই গুরুভার নিলেন কিসের জোরে।

বিম্ববতী

সুন্দরকে যে নারী সৌন্দর্যে ছাড়িয়ে যেতে চায় সে কি সুন্দরের বিপরীত মনোভাব ও চেষ্টা দ্বারা জগতে কৃতকার্য হতে পারে। সেই প্রয়াসে ফল হল কী।

কর্ম

কর্মের বিধান নিষ্ঠুর। মানুষের নিবিড়তম বেদনার উপর দিয়েও তার রথচক্র চলে যায়। এই কবিতায় যে ভৃত্যটির কথা আছে রাত্রে

তার মেয়েটি মারা গেছে, তবু কাজের দাবি থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু এই কবিতায় যে সকরুণতা প্রকাশ পেয়েছে সেটা কেবল এ নিয়ে নয়। সকালবেলায় কয়েক ঘণ্টা কাজে যোগ দিতে তার দেরি হয়েছিল, সেজন্য মনিব যখন ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন ঠিক সেই সময়ে মেয়েটির মৃত্যুসংবাদ পাবামাত্র মনিব লজ্জিত হলেন। প্রভু-ভৃত্যের ভেদের উপরেও কোন্ এক জায়গায় উভয়ের মধ্যে গভীর ঐক্য প্রকাশ পেল।

সামান্য ক্ষতি

কাশীর রাজমহিষী যখন সামান্য 'এক প্রহরের প্রমোদে' গরিব প্রজাদের কুটিরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন তখন তিনি অনুভব করতে পারেন নি ক্ষতিটা কতখানি। তার কারণ, তারা ওঁর কাছে এত ক্ষুদ্র যে ওদের ক্ষতিলাভকে নিজের ক্ষতিলাভের সঙ্গে এক মাপকাঠিতে মাপা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। সামান্য ব্যক্তির সত্যকার দুঃখ ও রানীর দুঃখের পরিমাণ যে একই এইটি বুঝিয়ে দেবার জন্যে রাজা কী উপায় অবলম্বন করেছিলেন।

বঙ্গলক্ষ্মী

এই কবিতা বাংলাদেশের মাতৃস্বরূপিণী মূর্তির বর্ণনা। মাতা আপন সন্তানের অযোগ্যতা ক্ষমা করেও অকুণ্ঠিতভাবে ক্ষমাপূর্ণ কল্যাণ বিতরণ করেন, সেই মাতৃধর্ম বঙ্গপ্রকৃতির সঙ্গে কি রকম মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রকাশ করে লেখো।

মূল্যপ্রাপ্তি

স্পর্শমণি কবিতার মধ্যে যে অর্থ পাওয়া গেছে এই কবিতার মধ্যেও সেই অর্থটি আর-এক আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

অকালে যে পদ্মটি ফুটেছিল সেইটি বুদ্ধদেবকে পূজোপহার দেবার জন্যে যখন দুই ক্রয়েচ্ছু ভক্তের আগ্রহে তার মূল্য ক্রমশই বেড়ে চলেছিল তখন মালীর মনে হল, যার জন্যে এই প্রতিযোগিতা স্বয়ং তাঁর কাছে এই পদ্মটি নিয়ে গেলে না জানি কত স্বর্ণমুদ্রাই পাওয়া যাবে। ভগবান বুদ্ধের কাছে যাবামাত্র তার মনে মূল্যের স্বভাব কিরকম বদলে গেল। কেন গেল। সনাতনের কবিতাটি স্মরণ করে সেটি বুঝিয়ে দাও।

মধ্যাহ্ন

মধ্যাহ্নে পল্লীপ্রকৃতির বিচিত্র বর্ণ গন্ধ শব্দ ও চঞ্চলতার সঙ্গে কবিচিত্তের একাত্মতা এই কবিতার বর্ণনীয় বিষয়। সেটি গদ্য ভাষায় লেখো।